বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় স্টুপিড শিক্ষক

আমিরুল মোমেনীন মানিক

কতিপয় মানে কিছু সংখ্যক। শিক্ষকতার মতো মহান পেশাকে যারা কলঙ্কিত করছেন তাদের মুখোশ খুলে দেয়াই...বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় স্টুপিড শিক্ষক...বইটির উদ্দেশ্য। নিজে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি শিক্ষক এবং টিভি সাংবাদিক হিসেবে শিক্ষাঙ্গনে এইসব চলমান কলুষতা দেখে বারবার লজ্জিত হই। এই সমালোচনা সংস্কারের উদ্দেশ্যে। একজন মার্কসিস্ট বলেছেন, নিজের বলয়ে থেকেই বৃত্ত ভাঙো। আমিও তাই মনে করি। আসুন, আত্মসমালোচনা করি পরিশুদ্ধির জন্য, একটি কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাঙ্গনের জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় স্টুপিড শিক্ষক

আমিরুল মোমেনীন মানিক
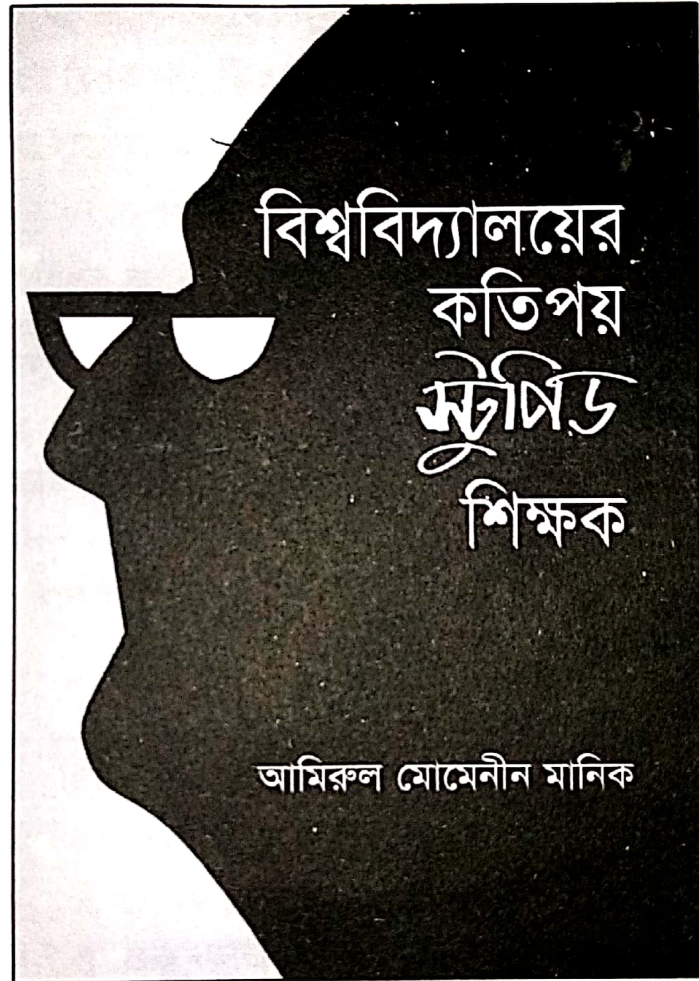
শিল্পতরু প্রকাশনী

উ ৎ স র্গ

নীতি ও সাহসীকতার প্রতীক

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আমাদের বিবর্ণ সংস্কৃতির নতুন সতেজ ঘাস

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী

মিডিয়া বিপ্লব কাকে বলে যার কাছ থেকে শিখে নিতে হয়

শামীম শাহেদ

আমাদের কালের নায়ক

সুপন রায়

জানালায় নতুন আলো-সম্ভাবনা

রবিউল ইসলাম জীবন

এবং

একজন সাদা মনের মানুষ

ইঞ্জিনিয়ার আবুল হাসান

সূ চি প ত্র

শ্বশুর আব্বা ও একজন সৎ মানুষের গল্প

এক.

আমি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আমার বাবা কৃষক। বাবার দশ সন্তানের সপ্তম জন। ছোটকালে মাঠে কাজ করে অনেক কষ্টে পড়ালেখা করেছি। মেট্রিক ও ইন্টার পাস করেছি গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে। কিন্তু রেজাল্ট ছিল খুব ভালো। মাথা শার্প ছিল তো তাই। ভর্তি হই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। পদার্থবিজ্ঞানে। ফার্স্ট ইয়ারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার পর নজরে পড়ি বিভাগের চেয়ারম্যানের। চেয়ারম্যান মাঝে মধ্যেই আমাকে নানা কাজে ডেকে পাঠান। শুধু তার চেম্বারে না, বাসাতেও। এভাবেই স্যারের সাথে অন্য রকম একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্যার তার বাসার কাজ থেকে শুরু করে যাবতীয় ফুটফরমাশের কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নেন। দিন যায়, বছর যায়। অনার্স ফাইনাল ইয়ারে আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হই। মার্স্টাসেও তাই। চেয়ারম্যান স্যার তখন ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী একজন শিক্ষক নেতা। স্যার বললেন, রজিত, শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদন করো। ভাবলাম, ভালো রেজাল্ট তাই কারো সাপোর্ট লাগবে না। ভাইবার আগের দিন চেয়ারম্যান স্যার আমাকে ডেকে পাঠালেন। অনেক আলাপ হলো। এক পর্যায়ে বললেন, দ্যাখো আমি চাইলে তোমার শিক্ষক হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।

কিন্তু একটা শর্ত আছে।

কী শর্ত স্যার!

না মানে, তোমাকে শিক্ষক বানিয়ে আমার লাভই বা কী?

স্যার, আমি তো আমার রেজাল্টের কারণেই শিক্ষক হওয়ার যোগ্য

শুধু কি রেজাল্ট দিয়ে শিক্ষক হওয়া যায়, বলো?

তাহলে?

না আমাকে একটু সহযোগিতা করো, আমিও তোমার পাশে দাঁড়াবো

কী সাহায্য স্যার? আপনি বললে সব করতে পারি।

না মানে আমি তোমার সাথে সম্পর্ক করতে চাই, আমার চার মেয়ের তিনজনের বিয়ে হয়ে গেছে, এখন ছোটটাকে নিয়ে বড় ঝামেলায় পড়েছি, ওকে তোমার কাছে পাত্রস্থ করতে চাই। তা ছাড়া, আমাকে শ্বশুর হিসেবে পাওয়া তোমার ক্যারিয়ারের জন্য অবশ্যই ইতিবাচক।

রজিত ভাবতেই পারে না এ রকম একটি প্রস্তাব দেবেন স্যার। শিক্ষক তাকে হতেই হবে। আবার, স্যারের সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষক হওয়াও অসম্ভব। কী করবে ভেবে পায় না রজিত। অনেক ভেবে অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়, স্যারের মেয়েকেই সে বিয়ে করবে।

রজিত প্রস্তাবে রাজি হলে এক সপ্তাহ পরেই স্যারের মেয়ের সাথে বিয়ে হয় তার। পরের সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পায় সে। শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয় রজিতের। তবে একটা দীর্ঘ হাহাকার, কষ্ট আর আফসোস যোগ হয় তার জীবনে। কারণ, স্যারের মেয়ে শায়লা তো বোবা।

দুই.

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে তুলকালাম ঘটে গেছে। ১৫ জুন ২০১১ তারিখে দৈনিক মানবজমিন প্রথম পাতায় ব্যানার হেড লাইনে একটি খবর প্রকাশিত হয়। শিরোনাম : ঢাবিতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। রিপোর্টার সোলায়মান তুষার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা এখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। সেই রিপোর্টের আলোকে এখানে দু-চারটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি।

উদাহরণ-১ : ঢাবির অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অষ্টম ব্যাচের ছাত্রী ইশরাত মহল বিবিএ ও এমবিএতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েও শিক্ষক নিয়োগ পাননি। পেয়েছেন ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থান

অধিকারী দু'জন। তাদের একমাত্র ছিল দলীয় পরিচয়।

উদাহরণ-২ : কোথাও শিক্ষকতা না করলেও দুর্নীতি ও অনিয়মের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে সম্প্রতি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে সরাসরি অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন স্বপন কুমার ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের নিয়মে বলা আছে, সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য ৭ বছরের শিক্ষকতা, অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় গবেষণা থাকতে হবে। কিন্তু স্বপন কুমার ঘোষের এক বছরেরও অভিজ্ঞতা নেই।

উদাহরণ-৩ : ২০০৯ সালে ঢাবির আরবি বিভাগে চারজন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়োগ দেয়া হয় পাঁচজনকে। ফলিত পদার্থবিজ্ঞানেও একই ঘটনা ঘটেছে। এখানে আবেদনকারীদের মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ও সেকেন্ড থাকলেও তাদের দলীয় পরিচয় না থাকায় নিয়োগ দেয়া হয়নি।

এভাবে অনিয়ম চলছেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যেন শপথ করেছেন। কর্তাব্যক্তিরা সহাস্যে বলেন, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ছিল, আছে এবং থাকবে।

তিন.

আমার আব্বা ছিলেন বেসরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক। বছর দুয়েক হলো রিটায়ার্ড করেছেন। জামালপুরের মেলান্দহের টনকী বাজারে ওই স্কুলটায় বাবা জয়েন করেছিলেন সত্তরের দশকে। নানা বিপত্তি, ঘাত, পতন এবং প্রতিপক্ষের অত্যাচারেও তিনি ছেড়ে দেননি স্কুলটা। কী এক অনিরুদ্ধ টানে থেকে গেলেন অবসরের শেষ দিন পর্যন্ত। তারও আগে তিনি চাকরি করেছেন ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে। আব্বার কাছে শুনেছি, সে সময় ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছিল ঘন জঙ্গলময়। এখন তো ঢাকার হৃৎপিণ্ড। মাঝে মাঝে আব্বা আফসোস করেন, ইস তখন যদি একখণ্ড জমি কেনা যেতো, তাহলে সেটা হতো কোটি টাকার সম্পদ।

আমরা তখন ছোট ছিলাম। আমার ভাই আর আমি। বার্ষিক পরীক্ষা

শেষ। শীতের মিষ্টি সকালে বাড়ির আঙিনায় ঘাসের মাদুরে বসে আব্বা পরীক্ষার খাতা দেখতেন। হঠাৎ হঠাৎ কোন কোনো ছাত্র আসত আব্বার কাছে। ইলিশমাছ, মিষ্টিদই অথবা অন্য কিছু নিয়ে। উদ্দেশ্য, নম্বর বাড়িয়ে নেয়া। উনি কখনো এসব উপঢৌকন গ্রহণ করেননি। বরং বকাঝকা দিয়ে ফেরত দিয়েছেন সব।

দীর্ঘ দিন আব্বা সাইকেলে করে স্কুলে গিয়েছেন। সকাল নয়টায় চলে যেতেন। ফিরতেন সন্ধ্যায়। মাগরিবের আজানের পরপর। সাঁঝবেলা হলে আব্বার সাইকেলের বেলের টুং টাং আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করতাম। কী যে মধুর লাগত ওই শব্দটা। ঘরের দরজা পেরিয়েই দেখতাম আব্বার ক্লান্ত মুখ। হাতে কোনো না কোনো খাবার অথবা উপহার। মাস ফুরালে আমরা উনার বেতনের জন্য মুখিয়ে থাকতাম। মা বলতেন, তোমার আব্বার আজ বেতন হবে। সে দিন কী যে আনন্দ হতো মনের ভেতর। সেই আনন্দটুকু কোনো উপমা, উৎপ্রেক্ষা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। সততার বৃত্তের বাইরে কোনো ধরনের চিন্তা করতেন না। জীবনের অমসৃণ পথে চলতে গিয়ে কখনো অন্যায়, অসততাকে প্রশ্রয় দিতে দেখিনি। শূন্য যাত্রা দিয়ে শুরু করেছিলেন। জীবনের প্রৌঢ় প্রান্তরে এসে এখন তিনি নিশ্চয় উপলব্ধি করেন, শুধু সত্যের পথে থেকেও অনেক অর্জন জমা হয়েছে তার ঝুলিতে। হয়তো, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অত বড় আঙ্গিনার শিক্ষক ছিলেন না, কিন্তু হৃদয়টা ছিল বিপুল ও বিশাল দৈর্ঘ্য-প্রস্থের।

আব্বাই আমার শৈশব জীবনের নায়ক। না খেয়ে থাকো তবু আদর্শচ্যুত হইও না, এখনো এ রকম চিন্তা ঘুরপাক খায় তার মন-মস্তিষ্কে। তাই, সাদা মনের মানুষ খোঁজার জন্য হন্যে হয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরি না। আমার আব্বাকে দেখি। মধ্য বয়সে তাকে মনে হতো যেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সংকল্প কবিতা পড়ার পর ওই কবিতার নায়কের মতো কাউকে দেখার ইচ্ছে হতো। চুপি চুপি ঘুমের মধ্যে আব্বাকে দেখতাম। ঠিক মনে হতো আরেকটা নজরুল। নানা পথপ্রান্তর পেরিয়ে, অসংখ্য মানুষের সাথে

পরিচিত হয়ে, সমাজের এপিঠ-ওপিঠ কাছ থেকে দেখেও ওরকম মানুষ খুব বেশি খুঁজে পাই না।

চার.

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো শিক্ষক ছিল না। কারণ, তিনিই ছিলেন মানবতার মহান শিক্ষক। বিদ্যা অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল (সঃ)। এখন তো প্রযুক্তি আর জ্ঞানবিজ্ঞানে সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে চীন। আমাদের বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ। সড়কপথে মিয়ানমার হয়ে আরো কাছে। কিন্তু এই বন্ধুদেশের কাছ থেকে আমরা কতটা অর্জন করতে পেরেছি। না জ্ঞানবিজ্ঞানে, না বন্ধুত্বে কোনো দিকেই আমরা নিতে পারিনি। তবে হ্যাঁ আমরা আরেকটা ধোলাইখাল বানাতে পেরেছি ঠিকই। চীনের যাবতীয় উৎপাদনসামগ্রীকে এখানে অবিকল নকল করতে পারেন আমাদের কারিগররা। মিতশুবিশি, পাজেরো বা অ্যালিয়েন কোনো ব্যাপারই না! হুবহু কপি করে দিতে পারেন তারা। পুচ্ছ পরে কাকের ময়ূর সাজার মতো বিষয়।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এখন ধোলাইখালের কারিগরে ভরে গেছে। তারা কি নকল মানুষ ছাড়া অন্য আর কিচ্ছু উপহার দিতে পারছেন? একজন আবুজর গিফারী অথবা চেগুয়েভারা অথবা ওমর খৈয়াম অথবা মার্টিন লুথার অথবা মাদার তেরেসা কি জন্ম দিতে পারবেন আমাদের এই আয়নার কারিগররা?

রোমান্টিক ইভটিজিং ও গিভ অ্যান্ড টেক

এক.

আধুনিক সময়ে একটা শব্দ খুব প্রচলিত গিভ অ্যান্ড টেক। পোস্ট-প্রফেশনালিজমের যুগে এর অবশ্য যৌক্তিকতা আছে। একটার বিনিময়ে আরেকটা। কাজের বিনিময়ে খাদ্য, কাজের বিনিময়ে টাকা– এ ধরনের প্রকল্পের কথা আমরা সবাই জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক এই নীতিকে সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করছেন। এই নীতিকে তারা প্রয়োগ করছেন নারী শিক্ষার্থীদের ওপর। সোজা কথায় বলি, ভালো রেজাল্ট মানে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে চাইলে তোমাকে অবশ্যই শিক্ষকের মন জোগাতে হবে। মন জোগানো কথাটা বিশ্লেষণ করলে এর ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহরা বিনোদনের জন্য রাজদরবারে নর্তকী রাখতেন। তাদের নৃত্য, গীত ও শারীরিক কসরতে পরিষদের মন উদ্বেলিত হতো। সপ্তাহে এক দিন মন ভরিয়ে বাকি ছয় দিন রাজকাজে নিবিড় মনোযোগী হতেন। এখন এ ধরনের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা না থাকলেও ক্ষমতাধররা লোকচক্ষুর অন্তরালে অনেক কিছুই করেন।

শিক্ষক বলে তাদের কি মন নেই? মনে কি ভালোবাসা নেই? আলবৎ আছে। তারা যদি বাংলাদেশী ক্লিওপেট্রা অথবা মোনালিসার খোঁজে মাঝে সাঝে গেয়ে ওঠেন– 'আজকে আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা' অথবা 'মন চাইলে মন পাবে/ দেহ চাইলে দেহ/ সবই হবে অগোচরে/ জানবে না তো কেহ...তাহলে দোষ কোথায়? যুক্তিবিদ্যার পণ্ডিতরা এ ব্যাপারে ভালো ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারবেন। কিন্তু সাধারণ্যে এই সব কাজ অসামাজিক বা অবৈধ বা নৈতিকতার পরিপন্থী হিসেবেই বিবেচিত।

দুই.

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল' আদ্যক্ষরের এক ছাত্রীর ঘটনা। কলা অনুষদে ভর্তি হওয়ার পর যোগ দেয় ক্যাম্পাসের একটি পরিচিত সাংস্কৃতিক সংগঠনে। সেই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন তার বিভাগের একজন প্রফেসর। সুশ্রী গড়নের হওয়ার কারণে প্রথম দিনই ওই শিক্ষকের নজরে পড়ে যায় সে। মাসখানেক যেতে না যেতেই ওই শিক্ষক জরুরি কাজে বাসায় ডেকে পাঠান ল'কে। শিক্ষক তো পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃতুল্য। যথারীতি হাজির হলো। সে দিন বাসায় ওই শিক্ষক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না ল'। এক কথা, দু'কথা, অনেক কথা।

একপর্যায়ে স্যার বললেন, দ্যাখো সংস্কৃতিবান হতে হলে তোমাকে অবশ্যই উদার হতে হবে। সংকীর্ণতাকে দূরে ঠেলতে না পারলে তুমি এগোতে পারবে না।

স্যার, মানে বুঝলাম না।

মানে তোমাকে পরিপূর্ণ আধুনিক হতে হবে। নারী আর পুরুষের ভেদরেখাকে ভেঙে দিতে হবে।

সে জন্যই তো আপনার সংগঠনে ভর্তি হলাম। আপনি তো আমাদের পিতার মতো, যা বলবেন তা-ই করব।

আরে পিতা না, আমি হলাম তোমাদের বন্ধু।

কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে ল'র পিঠে হাত রাখেন শিক্ষক। প্রথমে ভিরমি খায় ল'। এভাবেই শুরু। দিন যায়, বছর পেরায়। ল' ওই শিক্ষকের সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ক্লাসেও খুব একটা দেখা যায় না তাকে। নিয়মিত ক্লাস না করেও ভালো রেজাল্ট করতে থাকে সে। অনার্স ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা শেষ হলে ল'-এর গর্ভে চলে আসে সন্তান। কী করবে? বিষয়টি স্যারকে জানায় সে। বিয়ে করার জন্য চাপাচাপি শুরু করে মেয়েটা। আর এতেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন ওই শিক্ষক। মার্স্টাসে ফেল করিয়ে দেবার হুমকি দেন। আর জানাজানি হওয়ার আগেই সন্তান নষ্ট করার জন্য আলটিমেটামও দেন। অগত্যা ল' তাই করে। কিন্তু তার জীবনে ঘটে মর্মান্তিক এক ঘটনা। ভ্রূণ নষ্ট করতে গিয়ে মাতৃত্বের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে চিরদিনের জন্য।

স্যারের কথামতো চলার কারণে মাস্টার্সেও সে প্রথম হয়। কিন্তু হারিয়ে ফেলে একজন নারীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় মা হওয়ার ক্ষমতাটুকু। এরপর পেরিয়ে যায় আরো দু'বছর।

ল'-এর বিয়ে হয়। ছয় মাস যেতে না যেতেই স্বামী এই বিষয়গুলো জেনে যায়। তার ওপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতন। ২০০৮ সালের ২ জানুয়ারি সিলিং ফ্যানে ঝুলে আত্মহত্যা করে ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই শিক্ষক আর ল- এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া কেউ জানে না এই ট্র্যাজিক কাহিনী।

তিন.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটছে। পরিশুদ্ধ মননের কথা যারা বলেন তাদের কতিপয়ের দ্বারাই লাঞ্ছিত হয় আমাদের বোনেরা। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক কর্তৃক একজন সহকর্মী শিক্ষিকাকে যৌন হয়রানির অভিযোগ সারা দেশ তোলপাড় সৃষ্টি করে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের প্রতি এক ছাত্রীর যৌন নিপীড়নের অভিযোগও সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত ঘটনা। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যৌন নিপীড়নবিরোধী আইন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করার জন্যই সুনির্দিষ্টভাবে একটি আইন করা হয়। এর নাম হলো : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন-২০১০। এ আইনে বেশ কিছু আচরণকে যৌন হয়রানির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

> সরাসরি বা ইঙ্গিতে যৌন আবেদনমূলক আচরণ, শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের কোনো কাজ করা, প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক করার চেষ্টা।

> যৌন ইঙ্গিতবাহী কোনো কিছু উপস্থাপন বা প্রদর্শন বা উক্তি অথবা মন্তব্য করা, যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় এমন আবেদন করা, পর্নোগ্রাফি দেখানো, যৌন আবেদনময় কোনো ইঙ্গিত বা ইশারা করা।

> অশালীন অঙ্গভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের দ্বারা উত্ত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোনো ব্যক্তির অলক্ষ্যে নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ঠাট্টা বা উপহাস করা।

> চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ইমেইল, নোটিস, কার্টুনের মাধ্যমে বা বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, নোটিস বোর্ড, অফিস, কারখানা, ক্লাসরুম, ওয়াশরুম, বাথরুম বা যেকোনো স্থানে বা দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক কোনো কিছু লেখা বা অঙ্কন করা বা চিহ্নিতকরণ বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো অশালীন বা যৌনতা সংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু রাখা বা দেখানো ইত্যাদি, যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণে কমনরুম, ওয়াশরুম, বাথরুম বা এ ধরনের কোনো স্থানে উঁকি দেয়া, চরিত্রহননের উদ্দেশ্যে কারো স্থির বা ভিডিওচিত্র ধারণ ও সংরক্ষণ, প্রদর্শন, বিতরণ, বিপণন ও প্রচার বা প্রকাশ করা, লিঙ্গগত কারণে বা যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা বিরত থাকতে বাধ্য করা, প্রেমনিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা।

> প্রতারণার মাধ্যমে, ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা।

> যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ-সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ করতে অস্বীকার করার কারণে কোনো ব্যক্তির পদোন্নতি বা পরীক্ষার যথাযথ ফলাফল বা অন্যথায় যেকোন সুবিধাদি বাধাগ্রস্ত করা এবং যৌনপ্রকৃতির যেকোনো প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক, বাচনিক বা ইঙ্গিতমূলক অভিব্যক্তি -এই আইনে এসব আচরণকে যৌন হয়রানি বুঝাবে।

> শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটলে অভিযোগ কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে তিন বা পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠিত হবে। কমিটির প্রধান ও বেশির ভাগ সদস্য হবেন নারী। কমিটির একজন সদস্য থাকবে প্রতিষ্ঠানের বাইরে, যিনি নারীসংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে কাজ করবেন। যিনি হয়রানির শিকার হয়েছেন তিনি ঘটনা ঘটার ৩০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট বাক্সে অভিযোগ দায়ের করবেন। এই কমিটি অভিযোগটি যাচাই- বাছাই করবেন। অভিযোগ গুরুতর হলে প্রয়োজনে মামলা দায়েরের সব ব্যবস্থা ও সুপারিশ করবে কমিটি। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

অপরাধ কম হলে : তিরস্কার বা সতর্কীকরণ, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতি স্থগিত করা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাইমস্কেলে স্থগিত রাখা,

যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

আর অপরাধ বড় হলে : বাধ্যতামূলক অবসর, চাকরিচ্যুত, অব্যাহতি, বেতন-ভাতাদি বাতিল করা এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা।

যৌন নিপীড়নের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাজা হওয়ার বিষয়টি এখন ওপেন সিক্রেট। ৮ এপ্রিল ২০১০-এ দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন এখানে তুলে ধরা হলো।

: বিভাগের এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মামুনকে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়েছে প্রশাসন। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন। উপ-উপাচার্য বলেন, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্রীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী আবদুল্লাহ আল মামুনকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, এ ঘটনায় অধিকতর তদন্তের জন্য আরো একটি কমিটি করা হবে। ওই কমিটির প্রতিবেদন না দেয়া পর্যন্ত আবদুল্লাহ আল মামুনকে বাধ্যতামূলক ছুটি ভোগ করতে হবে।

পাঁচ.

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগের প্রভাষক মুমিত আল রশিদ। শিক্ষক নিয়োগ পাওয়ার পর বিবাহিত স্ত্রীকে অস্বীকার করে তালাক দিয়েছেন। তিনি ভেবেছেন : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছি, এখন তো অনেক ওপরে উঠে গেছি। জাতে উঠে গেছি। পুরোনো বউ দিয়ে কী হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিচয়ে সহসাই যে-কোন উচ্চবিত্ত অভিজাত পরিবারে বিয়ে করতে পারব।

মুমিত আল রশিদ, শিক্ষক হওয়ার আগে একই বিভাগের ছাত্রী সিফাত-ই খোদার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে সিফাতের চাপে বিয়ে করতে বাধ্য হন মুমিত। ২০০৫ সালে বিয়ে হয়। ২০০৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি। সামাজিকভাবে স্ত্রীর পরিচয় পাওয়ার জন্য দীর্ঘ চার বছর ধরনা দেন সিফাত। কিন্তু মুমিত নানা কৌশলে নিজেকে এড়িয়ে রাখার

চেষ্টা করে। সিফাত জোরাজুরি শুরু করলে তার ওপর নেমে আসে অমানুষিক বর্বর নির্যাতন। উপায় না দেখে ওই ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে লিখিত অভিযোগ করলে ফাঁস হয়ে পড়ে ভদ্রবেশী মুমিতের আসল রূপ। (রেফারেন্স : ২৭ ডিসেম্বর ২০১০, দৈনিক মানবজমিন)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের আরেক প্রভাষক মাহবুবুর রহমান অনিন্দ্য। ২০১০-এর জুনে বিয়ে করেন কুড়িগ্রামে। বিয়ের পর স্ত্রীকে স্বীকৃতি না দেয়ায় স্ত্রী সালমা চলে আসে ক্যাম্পাসে। হাজির হন শিক্ষকের আবাসস্থল জুবেরি ভবনে। ওই শিক্ষক আগে থেকে আঁচ করতে পেরে নিজের কক্ষে তালা লাগিয়ে চলে যান। রাতভর স্ত্রী বারান্দায় বসে কাটান। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়লে সালমাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে। সাম্প্রতিক সময়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে এই ঘটনা। (রেফারেন্স : ২৪ ডিসেম্ব ২০১০, দৈনিক সমকাল)।

ছয়.

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক এভাবে রোমান্টিক ইভটিজিং করেই চলেছেন। নির্যাতিত হচ্ছেন অনেকেই। তার প্রতিকার নেই খুব একটা। আর গিভ অ্যান্ড টেকের কবলে পড়ে সম্ভ্রম হারাচ্ছেন অনেক ছাত্রী। তার অল্পবিস্তর প্রকাশিত প্রচ্ছদে।

শিক্ষক হলেন বিবেকের আয়না। এ আয়নায় কিছু সংখ্যকের কুৎসিত রূপটুকু দেখতে পাচ্ছেন কি, আমাদের প্রিয় শিক্ষকরা?

টিচার্স পলিটিকস ডাকাতদের গ্রাম এবং ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া

এক.

বন্ধু তামিম হাসান। বিনোদন সাংবাদিকতার চৌহদ্দিতে খুব পরিচিত একজন। ২০১০-এর বইমেলায় তার লেখা বই 'সোজাসাপটার এই আমি' বের হয়। একটা কপি আমার হাতে আসে। বইটা পড়তে পড়তে হঠাৎ আমার চোখ আটকে যায় ৭৩ পৃষ্ঠায়।

তামিম লিখেছে :

একদিন আমার ডেস্কে একটা বইয়ের প্যাকেট রেখে গেছে কেউ একজন। প্যাকেট খুলে দেখি বন্ধু আমিরুল মোমেনীনের লেখা একটা বই। বইয়ের নাম 'ব্লাডি জার্নালিস্ট'। শুভেচ্ছাপত্রে মানিক লিখেছেন সোজসাপটা তামিম, সারাটা জীবন এমন সোজাসাপটা দেখতে চাই, মানিকের লেখা বইয়ের মতোই তো আমাদের সাংবাদিকদের জীবন। এক কথায় একটা থ্যাংকসলেস জব। মানিক হয়তো তার বইয়ে সাহস করে লিখতে পেরেছেন।

'ব্লাডি জার্নালিস্ট' বইটি পড়ে অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, কিংবদন্তি-মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, সাংবাদিক সুপন রায় থেকে শুরু করে অনেকেই।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় স্টুপিড শিক্ষক' লিখতে গিয়ে বারবার মনে দ্বিধা কাজ করছিল। আমি সাংবাদিক তাই নিজের পেশাকে নিয়ে সমালোচনা করতেই পারি। 'ব্লাডি জার্নালিস্ট' বইটি তারই স্বাক্ষর। শিক্ষকতা পেশার

সত্য ঘটনাগুলো তুলে ধরলে স্টুপিড শিক্ষক নাখোশ হবেন তা আমি জানি। তাতে আপত্তি নেই। 'কিন্তু কোনো একজন সৎ, উদ্যমী, সাহসী, মানুষ গড়ার কারিগরও যদি মনে কষ্ট পান, তাহলে আমার অপরাধবোধের অন্ত থাকবে না।'

বারবার সূর্যের মতো উঁকি দিচ্ছিল কথাটা।

এরই মধ্যে একটা কল এলো মোবাইল ফোনে। বৈশাখী টেলিভিশনের নিউজ প্রেজেন্টার ইমতিয়াজ আহমেদের। সংবাদ উপস্থাপনার পাশাপাশি উনি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের পাবলিক রিলেশন অফিসার। ইমতিয়াজ জানালেন, আমাকে তার ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রারের সই সমেত একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে আমার ঠিকানায়।

বুকের মধ্যে একটা ভালো লাগার বাতাস বয়ে গেল। কখনোই ইচ্ছে ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবো। খুব কাছ থেকে শিক্ষকদের অনৈতিক আচরণ দেখার সুযোগ হয়েছিল বলেই। তবুও ইমতিয়াজের খবরটা আমার কাছে সুখবর বলে মনে হলো। দুটো কারণে, এক. এখন থেকে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় স্টুপিড শিক্ষক' বইয়ের কাহিনীগদ্যের সাক্ষী এই লেখক শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র না শিক্ষকও বটে। দুই. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কতিপয় শিক্ষকের বেআইনি আচরণে আক্রান্ত হওয়ার পর আমার আশ্রয় হয়েছিল এই এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে। রা.বি থেকে অনার্স করার পর মাস্টার্সে ভর্তি হই এখানে। আর সর্বোচ্চ নাম্বার নিয়ে অর্জন করি মাস্টার্স ডিগ্রি। সেই ক্যাম্পাসেই আবার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়া। দারুণ অনুভূতির ব্যাপার।

একজন মার্কসিস্ট বলেছেন, নিজের বলয়ে থেকে বৃত্তকে ভাঙো, নিজের দেয়াল নিজে ভেঙে পরিবর্তনের সূচনা করো। এশিয়ান ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রারের ওই চিঠি পাওয়ার পর সাংবাদিকের পাশাপাশি আমি নিজেকে একজন শিক্ষক হিসেবে ভাবছি। যদিও একেবারেই নবীন। এখন সমালোচক উইপোকারা নিশ্চয়ই আর পাখা ঝাপটাবে না। আমিও জোরগলায় বলতে চাই, হ্যাঁ, আমি আমার নিজের পেশাকেই সমালোচনা করছি। শুভ পরিবর্তনের জন্য।

দুই.

ছোটকালে ঘুড়ি বানাতাম। খুব মজা করে। শখের ঘুড়ি। নারকেলের পাতার শলাকার সেই সব ঘুড়ি এখনো চোখে ভাসে। ঘুড়ি বানানোর জন্য দু'টাকা হলেই লাল, নীল, বেগুনি, হলুদ নানা রঙের কাগজ পাওয়া যেত। রঙের নামগুলো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা লিখতে গিয়ে আবার সেসবের কথা মনে পড়ে গেল। বাংলাদেশের কোনো কিছুই রাজনীতিমুক্ত থাকল না। এখন তো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা লাল, নীল, সাদা, হলুদ, বেগুনি নানা রঙে বিভক্ত হয়ে গেছেন। তারা শুধু নিজেরা এই রঙকে ধারণ করছেন না বরং ছড়িয়ে দিচ্ছেন শিক্ষার্থীর মধ্যে। এ দেশে এমন কোনো পাবলিক ভার্সিটি নেই যেখানে রাজনীতি নেই। হ্যাঁ, দু-একটিকে দাবি করা হয় আউট অব পলিটিকস। যেমন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু নানা ফোরাম আর সামাজিক সংগঠনের নামে সেখানেও রাজনীতির চর্চা চলছেই। তাতে কোনো সমস্যাও ছিল না। সেই রাজনীতি যদি ছাত্রদের কল্যাণে হতো। শিক্ষক নির্বাচন নিয়ে রীতিমতো এলাহি কাণ্ডকারখানা অবস্থা। অনেক সময় এ নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে রূপ নেয়। মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষকরা দু'ভাগে খণ্ডিত হয়ে যান।

টিচার্স পলিটিকসের একটা কুপ্রভাব অবশ্যই শিক্ষার্থীদের ওপর পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংগঠনগুলো পৃষ্ঠপোষকতা পায় এই খণ্ডিত শিক্ষকদের। আর জাতীয় নেতৃত্বে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে শিক্ষাঙ্গনেও– এটা সবারই জানা। এ সময় সুবিধাভোগ করেন ক্ষমতাসীন আদর্শের শিক্ষকরা। সম্প্রতি এই প্রবণতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। সে কারণে পাঠদান থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রাবাসে সিট বন্টন, টেন্ডার, সব কিছু এখন নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষক রাজনীতি।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ একদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ডাকাতের গ্রাম হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। একুশ শতকেও এই কমপ্লিমেন্ট ধরে রেখেছে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বড় ছাত্র হত্যার ঘটনা- সেভেন মার্ডার। গত চল্লিশ বছরে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে। জাতি অসংখ্য প্রতিভাকে অকালে হারিয়েছে। কিন্তু এসবের কোনো

একটিরও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন বেরোয়নি। সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড হয়েছে রাজশাহী আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। অসংখ্য ছাত্র হত্যা হয়েছে। মাথার নিচে এক ইট আর উপরে আরেক ইট দিয়ে থেতলিয়ে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু বিচার কি হয়েছে? এই বিচার হতে দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই। এমনকি, নিহত ছাত্রকে যারা নিজেদের সংগঠনভুক্ত বলে দাবি করেছে তারাও আন্তরিকভাবে তাদের কর্মীদের বিচার চায়নি।

তিন.

শেয়াল পণ্ডিতের কাছে কুমিরের বাচ্চার পড়ালেখা শেখার গল্প মনে আছে তো? বেচারা মা কুমির সন্তানদের শিক্ষিত করতে চাইলেন আর পণ্ডিত মশাই একি করলেন? আমাদের কতিপয় শিক্ষকরা কি শিয়াল পণ্ডিত হয়ে গেলেন? তাদের কাছে কি সন্তানদের অভিভাবকত্ব দেওয়ার সাহস করবে একুশ শতকের অভিভাবকরা।

চার.

২০০৭ সালের ওয়ান ইলেভেনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। ২০০৯ সালে জাতীয় নির্বাচনের পর থেকে তিনি প্রায় নির্বাসনে আছেন। তার অবস্থান মার্কিন মুলুকে। একদিন পত্রিকায় সিংগেল কলামে একটি খবর দেখে চোখ ছানাবড়া। ড. ফখরুদ্দীন এখন ইউনিভার্সিটি অব ভার্জেনিয়ায় শিক্ষকতা করে সময় কাটাচ্ছেন। খবরটা দেখে মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। অবৈধ শাসনে দেশটাকে গণধর্ষণ করলেন। এখন কোন সাহসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পেশাকে কলঙ্কিত করছেন ফখরুদ্দীন?

পাঁচ

'আজকালের খবর' পত্রিকার নাম হয়তো শুনেছেন আবার না-ও শুনতে পারেন। পত্রিকাটা তত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ২০১১ সালের ২রা ডিসেম্বর একটি সিরিয়াস খবর ছাপা হয় এতে। প্রথম পাতার প্রথম কলামে। শিরোনাম : জবির অধ্যাপক নিয়োগে শর্ত শিথিল রাজনৈতিক নিয়োগের সুবিধা সৃষ্টি। রিপোর্টার: মাহবুব মমতাজী। রিপোর্টে বলা হয়েছে, জগন্নাথ

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারে যে শর্ত ছিল তা শিথিল করেছে প্রশাসন। রাজনৈতিক বিবেচনায় অভ্যন্তরীণ সহযোগী অধ্যাপকদের পদোন্নতি দেয়ার জন্যই এটি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে তারা শিক্ষার মান নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, প্রভাবশালী কিছু শিক্ষকের চাপে সার্ভিস রুলস কমিটির পরামর্শ ছাড়াই গত ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় কোন শ্রেণীতে বা ক্যাটাগরিতে শর্ত শিথিল করা হবে তা উল্লেখ না করে এ সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা জানান, প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তের ফলে রাজনৈতিক বিবেচনায় দলীয় শিক্ষকরা অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ার সুযোগ পাবেন। অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য যে মানদণ্ডগুলো উল্লেখ করা হয়, তা হলো– ওই পদের প্রার্থীদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাণ্ডিত্য থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর যেকোনো একটিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩ দশমিক ৬০ অথবা প্রথম শ্রেণীসহ শিক্ষাজীবনে ন্যূনতম দুটি প্রথম বিভাগ/শ্রেণী/জিপিএ-৩ থাকতে হবে। স্বীকৃত জার্নালে ন্যূনতম ১০টি প্রকাশনা থাকতে হবে। আর সহযোগী অধ্যাপক পদে থাকাকালীন সময়ে ন্যূনতম চারটি প্রকাশনা থাকতে হবে। প্রার্থীদের স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনতম ২০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক পদে ন্যূনতম আট বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। একই ক্ষেত্রে এমফিল ডিগ্রিধারীদের ন্যূনতম ১৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক পদে ছয় বছরের, পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের ন্যূনতম বারো বছরের, সহযোগী অধ্যাপক পদে ন্যূনতম চার বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এগুলোর মধ্যে আসলে কোন ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়েছে তা স্পষ্ট না করায় অবৈধ সুবিধা দেয়ার সুযোগ করে দেয়া হলো।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী সাইফুদ্দীন, দর্শন বিভাগের ড. নূরুল মোমেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. অরুণ কুমার গোস্বামী, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাইফুল

ইসলাম অধ্যাপক নিয়োগের নীতিমালা সংশোধনের আবেদন করেন। তাদের আবেদন যাচাই না করে উপাচার্য বিষয়টি সমর্থন করে সিন্ডিকেটে উপস্থাপনের সুপারিশ করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়ার ক্ষেত্রে শর্ত শিথিল করা হয় না। শুধু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। তিনি আরো জানান, শর্ত শিথিলের ক্যাটাগরি নির্দিষ্ট না থাকায় যাকে ইচ্ছে তাকে পদোন্নতি দেয়ার সুযোগ থাকবে।

এর কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, যারা শর্ত শিথিলের আবেদন করেছেন, তারা সংশ্লিষ্ট পদে পদোন্নতির আবেদন করেছেন। বিদ্যমান শর্ত অনুযায়ী, তাদের আবেদন করার কোনো যোগ্যতা নেই। তাই এর সহজ প্রক্রিয়া বের করার জন্য এই রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেন। বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা জানান, শর্ত শিথিল করা হলে শুধু শিক্ষার মানই নষ্ট হবে না, একই সঙ্গে রাজনৈতিক বিবেচনায় অধ্যাপক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এটি শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা টেনে আনবে। কৃত্রিমভাবে পদ সৃষ্টি করে অধ্যাপক পদ পূরণ করার মাধ্যমে দেশ-বিদেশে এ প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

এ ব্যাপারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ জানান, অভ্যন্তরীণ শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা দিতে হয়। কারণ তারা এখানে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন।

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে যারা রিপোর্টটি পড়লেন তাদেরকে থ্যাংকস। যে সব শিক্ষক শুধু নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে অনৈতিকতার বেশ্যাখানা বানাতে চান, তাদের প্রতি এ দেশের কোটি কোটি অভিভাবকের ঘৃণা বর্ষিত হোক।

বিশ্ববিদ্যালয় পালানো শিক্ষকরা

এক.

'আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি/মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি।' ছোট্টকালে খুব জনপ্রিয় ছিল এ ছড়াটা। আমাদের স্কুলের কোনো ছাদ ছিল না। কোনো এক ঝড় উড়িয়ে নিয়েছিল। ওপরে আসমান, নিচে ভাঙা খানাখন্দের মতো ফ্লোর। এখানে বসেই বিদ্যাশিক্ষা। বৃষ্টি এলে দেছুট... , কিন্তু পড়ালেখায় আগ্রহের কমতি ছিল না। বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ছিল অল্পবিস্তর। পাঁয়ে হেঁটেই যেতাম। তবে পাঁয়ে কোনো জুতা বা স্যান্ডেল ছিল না। ভাবতে অবাকই লাগে। হাইস্কুলে ওঠার আগ পর্যন্ত খালি পায়েই যেতাম। জুতার অভাব ছিল এমন নয়। নগ্ন পা দুটি মাটির স্পর্শ পেয়ে সজীব হয়ে উঠত। সেই স্পর্শ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ত বলে নিজেকে তখন লোকজ মানুষ মনে হতো। আর এখন বছরে একবারো মাটির স্পর্শ পায় না শহুরে পা দুটো। যা-ই হোক সেই দুরন্তবেলায় ছুটি মানে আমাদের কাছে অন্য রকম অসাধারণ এক আনন্দের ব্যাপার ছিল। দুধ-চিতই পিঠা খাওয়ার চেয়ে কম আনন্দের না। যেদিন থেকে স্কুলে ছুটি হতো, মনে হতো তীব্র গরমে এক পশলা বৃষ্টি নেমে এলো। স্কুল পেরিয়ে হাইস্কুল। তারপর কলেজ। ধীরে ধীরে ছুটি নিয়ে যে অনুভূতি, তার পারদ নিচে নামতে থাকল।

দুই.

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ছুটিটাকে উৎপাত মনে হতো। সাংস্কৃতিক তৎপরতায়

এতটা ব্যস্ত ছিলাম যে, ছুটি এলেই সব কাজে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ছেদ পড়ত। অনেক ছুটিতে বাড়ি যাইনি। ক্যাম্পাসে থেকে গেছি। তখন অবশ্য দারুণ স্বপ্নেরা ভো ভো করত মস্তিষ্ক। কিসের ছুটি, কাজ করো, কাজ-অনুভূতিটা ছিল এ রকম।

কিন্তু ক্লাসে গিয়ে মাঝে মাঝে 'ছ্যাকা' খেতে হতো। দু-এক দিন পর পর শুনতাম– অমুক স্যার দেশের বাইরে আছেন অথবা গবেষণায় রত অথবা জরুরি পাণ্ডিত্য অর্জনের কাজে ব্যস্ত আছেন, তাই ক্লাস হবে না। বিরক্ত লাগত। অনেক সময় শিক্ষকদের মধ্যে ছুটি নেয়ার একটা নীরব প্রতিযোগিতা চলত। ছাত্ররা ক্লাসে আসে কিন্তু শিক্ষকরা অনুপস্থিত। ছেলেবেলায় যেমন সুযোগ পেলে স্কুল ফাঁকি দিতাম, ঠিক তার উল্টোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা হচ্ছেন লর্ডের মতো। বিপুল ক্ষমতার মালিক। একজন শিক্ষক ইচ্ছে করলে কোনো ছাত্রকে ফার্স্ট ক্লাস মার্ক দিতে পারেন, চাইলে ওই ছাত্রকে আবার ফেলও করাতে পারেন। তাই মুখে কুলুপ দেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। শিক্ষার্থীদের ওপর আধিপত্য করার পরিপূর্ণ ক্ষমতা থাকায়, তারা জেনেবুঝেই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। অভিযোগটা সবার ক্ষেত্রে না। বেশির ভাগের মধ্যে এই প্রবণতা। ভাইবা-ভোসি পরীক্ষায় শিক্ষকরা স্বমহিমায় আবির্ভূত হন। কারো প্রতি আক্রোশ থাকলে তার পুরো প্রতিশোধ নেয়ার ওটাই মোক্ষম সুযোগ।

তাই কোনো শিক্ষক দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ছুটিতে থাকলেও কারো করার কিচ্ছু নেই। সবাই প্রতিবাদহীন। নচিকেতার গানটার মতো... কোন এক উল্টো রাজা উল্টো বুঝলি প্রজার দেশে/ চলে সব উল্টো পথে উল্টো রথে উল্টো বেশে/ সোজা পথ পড়ে পায়ে সোজা পথে কেউ চলে না/ বাঁকা পথে জ্যাম হরদম/ জমজমাট ভিড় কমে না।

২০০৮ সালের ১ জুন প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ সবার নজরে আনছি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভা : শিক্ষককে

অপসারণ, গবেষণা না করলে টাকা ফেরত দিতে ১৩ জনকে সতর্ক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি।

ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক হাজেরা বেগমকে সহকারী অধ্যাপক পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে অর্থ নিয়ে গবেষণা শেষ করতে না পারায় ১৩ জন শিক্ষককে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

আগামী ছয় মাসের মধ্যে গবেষণা শেষ করতে না পারলে নিয়মানুযায়ী এসব শিক্ষককে অর্থ ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। এ ধরনের সংবাদ হরহামেশা দেখা যাচ্ছে।

একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে বেআইনিভাবে দেশের বাইরে অবস্থান করার কারণে ২০৫ জন শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন। আর স্বাধীনতার পর একই কারণে শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১২৩ জন শিক্ষক চাকরিচ্যুত হয়েছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাছুটিতে আছেন ৩৯৩ জন শিক্ষক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় অবস্থানে। ১৯৯১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত অবৈধভাবে ছুটি নিয়ে বিদেশে অবস্থানের কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৪ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই কারণে সাতজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দা ফাহলিজা বেগম ছুটি নিয়ে লন্ডনে যান। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে ফিরতে না পারায় তাকে অব্যাহতি দিয়েছে জাবি কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষাছুটিতে যাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ জন শিক্ষকের কোনো হদিস নেই। তারা কে কোথায় আছেন কেউই জানে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তাদের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা আছে ১ কোটি ৪৩ লাখ ২৫ হাজার ৯৯১ টাকা। (রেফারেন্স : দৈনিক আমাদের সময়, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১)।

তিন.

সেলুকাস! মানুষ গড়ার কিছু সংখ্যক মুখোশধারী কারিগর আজ নিজেরাই অন্য প্রাণীতে পরিণত হচ্ছেন। শিয়ালের কাছে কুমিরছানার শিক্ষা অর্জনের সেই গল্প তো সবাই জানেন। সেই ঘটনার যেন আধুনিক পুনরাবৃত্তি। তবে সৌভাগ্যের কথা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো অনেক নীতিবান শিক্ষক আছেন। তাদের কল্যাণেই দু-চারজন প্রকৃত মানুষ পাচ্ছে এই জাতি।

হুমায়ূন আহমেদ, ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ এবং অকল্যান্ডের আজগুবি গল্প

এক.

হুমায়ূন আহমেদ। খুব জনপ্রিয় লেখক। দীর্ঘ লাইনে শত শত মানুষ। প্রতি বইমেলায় এ রকম দৃশ্য চোখে পড়ে। উদ্দেশ্য হুমায়ূন আহমেদের বই কেনা। বাংলাদেশের অন্য লেখকের ক্ষেত্রে এটি অসম্ভব। হুমায়ূন স্যারের বই বিক্রি হয় নিত্যপণ্যের মতো। স্যার বললাম! না তিনি সরাসরি আমার শিক্ষক নন। তবে এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। স্বেচ্ছায় তিনি অবসর নিয়েছেন এ পেশা থেকে। কিন্তু কেন? আনন্দের ভেতর দিয়ে সমাজকে তুলে ধরার অনির্বাণ ইচ্ছা ছিল তার। তাই শিক্ষকতার খোলস ছেড়ে দিলেন হুমায়ূন আহমেদ। বের হয়ে এলেন সদ্য জন্ম নেয়া হরবোলা পাখির মতো। দু'হাত উজার করে পাঠককুলকে দিতে শুরু করলেন আনন্দকাব্য। অকৃপণ ঢেলে দিলেন এবং এখনো দিচ্ছেন। কিন্তু এখন হুমায়ুন স্যারকে নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ বিব্রত হই। মনের গহিনে ঘৃণা জন্মে। কী কারণে তিনি প্রথম স্ত্রী গুলতেকিন ও সন্তান-সন্ততিকে ছেড়ে দিলেন? যাক, কারণ থাকতেই পারে। অথবা ভালো না লাগলে ছেড়ে দিতেই পারেন। এটা তার ব্যক্তিগত বিষয়। আপত্তি নেই। বড় আপত্তি এক জায়গায় আছে। প্রথমপক্ষের সন্তানদের তিনি বেমালুম ভুলে আছেন। শাওনের দুই ছেলেই যেন তার সব। গুলতেকিনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এক দিনের জন্যও খোঁজ নেননি আগের সন্তানদের। একজন জীবনবাদী লেখক হয়ে কী করে তিনি ভুলে গেলেন দীর্ঘ সংসারজীবন, সন্তানদের ভালোবাসা? বিস্মিত হই আপনার

ব্যক্তিজীবনের রূপ দেখে। হুমায়ূন স্যার, আপনার এ কী চেহারা! আপনার সৃষ্টির সঙ্গে এগুলোর কোনো মিল পাই না। গুলতেকিনের সন্তানরা কি পিতা হিসেবে আপনার পরিচয়ে বড় হতে পারবে? নাকি পরিচয় দেবে অ্যারিস্টোক্রেট ব্রোকেন ফ্যামেলির সন্তান হিসেবে?

সেদিন একজন জিজ্ঞেস করলেন– হুমায়ূন আহমেদ কোন সাবজেক্টের ছাত্র ছিলেন। বললাম, রসায়ন। অবাক হলেন লোকটা।

অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কেন?

আরে ভাই, রসায়নের রসই তো হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যে ভরপুর।

কথা শুনে হাসলেন চোখট্যারা লোকটা।

আচ্ছা মানিক সাহেব, হুমায়ূন আহমেদ কী করে তার ছাত্রীর বয়সী শাওনকে বিয়ে করলেন বলতে পারেন?

এটা তো তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি কী বলবো।

না, আপনি তো সাংবাদিক, তাই আর কি।

আচ্ছা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কি এমনই?

কেন?

না, ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকের সখ্যতা নিয়ে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই তো অনেক কিছু শোনা যায়।

দূর, পাকা ধানের মধ্যে ওরকম দু'চারটা চিটে থাকেই। তার মানে কি সবাই!

লোকটা কথা থামাচ্ছে না। স্যারকে নিয়ে নানা কথা বলছেই। ওই সব কথার কোনো উত্তরও আমার জানা নেই। একপর্যায়ে স্যারকে বকাবকি শুরু করল। কানে কাঁটার মতো আঘাত করছে।

উপায়ন্তর না দেখে দিলাম ভোঁ-দৌড়। দেখি লোকটা আমার পিছু নিয়েছে।

চিৎকার করে বলছে, তুমিও তো লেখালেখি করো, তুমি শালা হুমায়ূনের চ্যালা। সত্যি কথা বলতে ভয় পাও?

দুই.

অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। ডাক্তার এ কে এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে অব্যাহতি দিলো বিএনপি সরকার। রাষ্ট্রপতির চেয়ারে বসলেন প্রবীণ এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। বসলেন মানে বসানো হলো। ইয়াজউদ্দিন সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না কখনোই। তবে তিনি অল্পবিস্তর জাতীয়তাবাদী ঘরানার সমর্থক। যাক তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিশ্চয় ডিজিডিএফআইয়ের রিপোর্ট দেখেই তাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়েছিলেন। অথবা ঘনিষ্ঠভাজন কারো পরামর্শে। সেসব বিতর্ক করে এখন লাভ নেই। কথা হলো ওয়ান ইলেভেন নিয়ে। ওয়ান ইলেভেনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ইয়াজউদ্দিন। প্রায় দু'বছরের অন্যায় শাসনের পিতা তিনি। ক্ষমতা, স্বার্থ আর পঁচা-গলিত-ঘৃণিত মোহান্ধ মানুষকে কতটা পশু করতে পারে তার– বিরল নজির স্থাপন করেছেন তিনি।

তার স্ত্রী হাসিনা মমতাজ বরাবরই দাবি করে আসছেন (তখন এবং এখনো) ইয়াজউদ্দিন ভীষণ অসুস্থ। প্রশ্ন হলো, তাহলে অসুস্থ ইয়াজউদ্দিন কিভাবে ওয়ান ইলেভেনের দুবছরের অপশাসনের ভার বহন করলেন? অত্যন্ত সচেতনভাবেই এই লেখায় 'তার' শব্দটির ওপর চন্দ্রবিন্দু দিলাম না। বিশিষ্টজন বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্মানার্থে সাধারণত এটি দেয়া হয়।

অনেক দিন পর এক কর্নেল বন্ধু আমাকে ফোন দিলো।

মানিক, ইয়াজউদ্দিন নাকি অসুস্থ?

হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

তো, পারলে একটা রিপোর্ট করো, লোকটা জাতির জন্য অনেক কিছু করেছে...

তাই নাকি, আমি তো জানি না!

ইয়াজউদ্দিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন। তার পাশে তো কারো-না-কারো দাঁড়ানো দরকার।

একজন মীরজাফরের পাশে দাঁড়াবো আমি!

তার মানে?

কারফিউ জারি করে সাংবাদিকের পশ্চাদ্দেশে সেনাবাহিনীর লাঠির আঘাত যখন পড়েছিল, তখন এই ত্রাণকর্তা খুব মজা পেয়েছিলেন। ওয়ান ইলেভেনে যখন সিডর আক্রান্তদের জন্য তহবিল সংগ্রহের নামে কোটি কোটি টাকা লুটপাট হচ্ছিল, তখন কোথায় ছিলেন এই ভদ্রলোক? অবৈধ, বেআইনি, অস্বাভাবিক, অনৈতিক একটি সরকারের মস্তিষ্কে বসে থাকা এই লোকটা তখন বিবেকের তাড়নায় পদত্যাগ করলে কী হতো? প্রতিবাদও তো করতে পারতেন? কী হতো? অন্ধকারের কীটরা তাকে মেরে ফেলত? প্রয়োজনে মরতেন। জাতির কাছে চিরদিন নায়ক হয়ে থাকতেন।

এইসব অকাট্য বক্তব্য শুনে আমার বন্ধু ভিরমি খেলো।

স্যরি, দোস্ত।

ফোনের লাইনটা কেটে গেল।

পাশের মসজিদে তখন নামাজ শেষে মোনাজাত হচ্ছিল। ইমাম সাহেবের আকুতি জানালার ফাঁক গলে আমার কানে এসে পৌঁছল।

ইয়া আল্লাহ, ওয়ান ইলেভেনের সময় আমার আব্বার কাছে চাঁদা চেয়েছিল। বিপুল অঙ্কের চাঁদা দেয়ার সামর্থ্য ছিল না তাঁর। প্রশাসনের সহায়তায় তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। পিঠমোড়া করে বেঁধে রাতের অন্ধকারে গুলি করে খুন করা হলো আব্বাকে। ইয়া আল্লাহ, এক সন্তান তোমার দরবারে তার পিতার ঘাতকদের বিচার চাচ্ছে। এ দেশের স্থপতি শেখ মুজিব হত্যার বিচার চেয়েছিলেন কন্যা শেখ হাসিনা। সেই মোনাজাত তুমি কবুল করেছো আল্লাহ। তাহলে আমার ফরিয়াদ কেন শুনবে না? ইয়া আল্লাহ, শুনেছি ইয়াজউদ্দিন অসুস্থ। আমার আব্বাকে হত্যার দায়ে জঘন্যভাবে যেন তার মৃত্যু হয়– তোমার কাছে এই দাবি করছি।

দশ-বারোজন লোক সাথে সাথে আমিন বলে উঠল।

এ ধরনের রাজনৈতিক মোনাজাত কখনোই শুনিনি। বিস্মিত হলাম। এ রকম হতে পারে! নিজের কানকেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। বন্ধু মিজান কখন যে পাশে দাঁড়িয়েছিল খেয়ালই করিনি। কাঁধে ওর হাতের স্পর্শ পেয়ে খেই ফিরে পেলাম। ঘাড় ফেরাতেই বলল– একজন ক্রিমিনাল টিচার ইয়াজউদ্দিন। অর্থ

আত্মসাৎ করলে কেউ যদি চোর হয়, তাহলে জনগণের অধিকার হরণকারীরা কি বড় চোর নয়?

এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

তিন.

অকল্যান্ডের লেখক মরিস ইরাকসন। তিনি 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার সহজ উপায়' নামে একটা বই লেখেন। বইটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হলে কী করতে হয় তা ব্যঙ্গ করে তুলে ধরা হয়। এজন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাপক আলোচিত হন তিনি। কিন্তু সেখানকার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাকে নিষিদ্ধ করে। কোনো শিক্ষার্থীর কাছে বইটি পাওয়া গেলে তাকে বহিষ্কারেরও নির্দেশনা দেয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বাজারে ইরাকসনের বইয়ের জন্য ঢল নামে ছাত্রছাত্রীদের। কিন্তু সব বই বাজেয়াপ্ত করে প্রশাসন। কড়া নজরদারির কারণে নিঃসঙ্গ ও একা হয়ে পড়েন ইরাকসন।

এর পাঁচ বছর পরের ঘটনা।

ওই অঞ্চলের শিক্ষা খাতে ব্যাপক অনিয়ম ছড়িয়ে পড়ে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে শিক্ষাব্যবস্থা। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় একটি নীতিমালা প্রণয়নের। যার মাধ্যমে তারা ঢেলে সাজাবে শিক্ষা খাত। কিন্তু নীতিমালা তৈরির লোক খুঁজে পায় না তারা। যাকেই বাছাই করা হয়, দেখা যায় তিনি কোনো না কোন অনিয়মের সঙ্গে জড়িত। অবশেষে তারা দ্বারস্থ হন মরিস ইরাকসনের কাছে।

মরিস ইরাকসন প্রথমে 'না' করে দেন। কিন্তু বিপুলসংখ্যক অভিভাবক তাকে এ বিষয়ে কাজ করার সুপারিশ করে। অবশেষে রাজি হন তিনি। দু বছরের নিরলস পরিশ্রমে তৈরি করেন একটি সার্বজনীন শিক্ষা নীতিমালা।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার সহজ উপায়' বইটি প্রকাশের পর একজন শিক্ষক ইরাকসনকে কষে চপেটাঘাত করেছিলেন। তিনি এখন নিয়মিত আসেন এই লেখকের চেম্বারে। ইরাকসনের কাছে নৈতিকতার শিক্ষা নিতে।

স্টুপিড শিক্ষক ও
আবদুল মান্নান ভূঁইয়া

এক.

আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে তো সবাই চেনেন। চেনেন না? না চেনার তো কথা নয়। না, আবার চিনবেনই বা কেন? অনেকেই ভেবে বসে আছেন যে, আমি হয়তো প্রয়াত রাজনীতিক মান্নান ভূঁইয়ার কথা বলছি। না, আমি বলছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনা এক যুবকের কথা।

দুই.

আবদুল মান্নান ভূঁইয়া কুমিল্লার ছেলে। ১৯৯৫-১৯৯৬ সেশনে ভর্তি হন মতিহারের মায়াময় স্নিগ্ধ ক্যাম্পাস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনার্স প্রথম বর্ষ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর নম্বর পান। দ্বিতীয় বর্ষেও প্রথম শ্রেণী। তৃতীয় বর্ষে শুধু প্রথম শ্রেণী নয়, রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পান। কিন্তু চতুর্থ বর্ষে পান দ্বিতীয় শ্রেণী। চার বছরে ১৬টি বিষয়ের ১৫টিতেই তিনি পেয়েছেন ৬২ দশমিক ৫০ শতাংশ নম্বর। শুধু একটি বিষয়ে তাকে দেয়া হয় মাত্র ৩২ নম্বর। অবিশ্বাস্য এই কম নম্বরের কারণে তার রেজাল্ট দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেমে আসে।

রেজাল্ট দেখে বিস্মিত হন আবদুল মান্নান।

তিন.

সবচেয়ে কম নম্বর পাওয়া বিষয়ের প্রথম পরীক্ষক ছিলেন ড. এ টি এম এনামুল জহীর। তিনি দিয়েছিলেন ৫৭। দ্বিতীয় পরীক্ষক খোরশেদুজ্জামান। তিনি দেন ৩১ নম্বর। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী, দুই পরীক্ষকের নম্বরের মধ্যে কমপক্ষে ২০ নম্বর তফাৎ হলে খাতাটি দ্বিতীয় পরীক্ষকের কাছে। পাঠাতে হয়। সে নিয়মানুযায়ী খাতাটি মূল্যায়নের জন্য তৃতীয় পরীক্ষক ড. বদর উদ্দীনের কাছে পাঠানো হয়। তিনি নম্বর দেন ৩৩। তিনটি নম্বরের মধ্যে কাছাকাছি দুটি নম্বর যোগ করে তার সমান অর্ধেক দিতে হবে–এটাই হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি। সে হিসেবে আবদুল মান্নানকে দেয়া হয় ৩২ নম্বর (৩১+৩৩ = ৬৪/২ = ৩২)।

আবদুল মান্নান নিশ্চিত ছিলেন, কোথাও অনিয়ম হয়েছে। নইলে, এত খারাপ রেজাল্ট কোনোভাবেই হতে পারে না। এর প্রতিকারের জন্য আবদুল মান্নান ছুটে যান পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ড. হাবিবুর রহমানের কাছে তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় পরীক্ষক খোরশেদুজ্জামান অন্যায় করেছেন। কিন্তু কোনো ধরনের প্রতিকারের আশ্বাস দিতে ব্যর্থ হন। এরপর এ বিষয়ে সমাধানের জন্য সাহায্য চান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ফয়েজউদ্দিনের কাছে। তিনি পরীক্ষার খাতা পুনর্মূল্যায়ন করার আবেদন করতে বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি সাইদুর রহমানের কাছে আবদুল মান্নান পরীক্ষার খাতা পুনর্মূল্যায়ন ও পরীক্ষণের আবেদন করেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে দীর্ঘ দিন ধরে ঝুলে থাকে ওই আবেদন।

এই সাপলুডু খেলতে খেলতে এলএলএম অর্থাৎ মাস্টার্স পরীক্ষা চলে আসে। সাহস করে পরীক্ষায় অংশ নেন তিনি। পরীক্ষায় নজিরবিহীন রেজাল্ট করেন আবদুল মান্নান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হন তিনি।

এই ফলাফলে মনের মধ্যে সাহসের দীঘি সমুদ্রে পরিণত হয়। আবদুল মান্নান নিশ্চিত থাকেন যে, আদালতে গেলে ন্যায়বিচার পাবেনই। আশায় বুক বেঁধে তিনি হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। আদালত

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি চার সপ্তাহের রুল জারি করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আদালতকে জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী খাতা মূল্যায়ন করা হয়েছে, এখন তাদের করার কিছু নেই। আবদুল মান্নান হতাশ হন না। হাইকোর্টের আরেকটি ডিভিশন বেঞ্চে এর প্রতিকার চেয়ে আবেদন করেন। আদালত ওই আবেদনের ওপর পূর্ণাঙ্গ শুনানি করে রায় ঘোষণা করে। রায়ে, বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, খাতা পুনঃপরীক্ষণ ও পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেয়। সেই সাথে হাইকোর্ট অভিমত দেয়, এ দেশের জনগণের ট্যাক্সে পরিচালিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের আচরণ অসৌজন্যমূলক ও দুঃখজনক।

আবদুল মান্নানকে তৎকালীন ভিসি আশ্বাস দিয়েছিলেন, হাইকোর্ট থেকে কোনো ইতিবাচক রায় আনতে পারলে তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের আপিল করবে না। কিন্তু ভিসি ওয়াদা ভঙ্গ করেন। সিন্ডিকেটের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল করেন।

আবদুল মান্নান হাল ছাড়েন না। পৈতৃক জমি বিক্রি করে সত্তর হাজার টাকা সংগ্রহ করেন মামলা পরিচালনার জন্য।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ২০০৫ সালের ১৩ জুন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দেয়। বহাল রাখে হাইকোর্টের রায়। হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন না করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশ হাজার টাকা জরিমানাও করে আপিল বিভাগ। রায়ে বলা হয়, সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল্য ও নীতিবোধ এত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও প্রতিফলিত হচ্ছে। ক্যারিয়ার ধ্বংসের এসব ঘটনার বিরুদ্ধে দেশের সচেতন মহলের পদক্ষেপ নেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নীতি-বিবর্জিত, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধহীন জায়গায় পরিণত হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশেষে বাধ্য হয়ে ২০০৫ সালের ১লা আগস্ট আবদুল মান্নানকে ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত এলএলবি সম্মান পরীক্ষায়

দেয়া দ্বিতীয় শ্রেণী বাতিল করে প্রথম শ্রেণী প্রদান করে। পাশাপাশি বিশ হাজার টাকা জরিমানাও দেয়।

উচ্চ আদালতের রায়ের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকদের শনাক্ত করে। এরা হলেন, ৩৩ নম্বর প্রদানকারী তৃতীয় শিক্ষক ড. বদর উদ্দীন আর ৩১ নম্বর প্রদানকারী দ্বিতীয় পরীক্ষক খোরশেদুজ্জামান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো কাজে আজীবন অংশ নিতে পারবে না বলে প্রথমজনকে শাস্তি দেয়া হয়। দ্বিতীয় জনকে ৯ বছর পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ।

চার.

'বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় স্টুপিড শিক্ষক'। কোনো বইয়ের এ রকম শিরোনাম বা নামকরণ দেখে নিশ্চয় অনেক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ক্ষেপে গেছেন আমিরুল মোমেনীন মানিকের প্রতি। সেই শিক্ষকের প্রতি অজুত শ্রদ্ধা রেখে বলছি, একটু আত্মসমালোচনা করুন তো, আবদুল মান্নানের ঘটনায় অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে শুধু স্টুপিড বলে আখ্যায়িত করা কি সুবিচার হবে? তবে এ কথা আমি কখনোই বলছি না যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নীতিবান শিক্ষক নেই। অবশ্যই আছেন। আর আছেন বলেই তো এখনো গোটা সমাজ পশুচারণভূমিতে পরিণত হয়নি।

পাঁচ.

দেশের সব সেক্টরে অনিয়ম ঢুকে গেছে। সবাই যেন অন্ধ হয়ে গেছে। জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, যারা অন্ধ তারা আজ সবচেয়ে বেশি চোখে দ্যাখে...। কিন্তু কই? আমরা তো চিরস্থায়ী অন্ধ হয়ে গেছি। আবার নীতিবাক্যও আওড়াচ্ছি। ঠিক যেন অন্ধের দেশে চশমা বিক্রি করার মতো অবস্থা। চিকিৎসা খাতে চলছে অবিশ্বাস্য অনিয়ম। আমাদের অধিকাংশ বাবা-মা ছেলে অথবা মেয়েকে ডাক্তার বানাবার স্বপ্ন দ্যাখেন। অনেক অর্থ

উপার্জন করা যাবে বলেই অধিকাংশ অভিভাবক চান তাঁর সন্তান চিকিৎসক হোক। ক'জনে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে, আমার সন্তান ডাক্তার হয়ে গরিবের জন্য নিজেকে সমর্পণ করবে। নচিকেতা যথার্থই বলেছেন, কসাই জবাই করে প্রকাশ্যে দিবালোকে/তোমার আছে ক্লিনিক আর চেম্বার ও ডাক্তার। ছাত্রজীবনে রাতদিন শুধু পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকা প্রকৌশলীরাও এখন দুর্নীতি শিখে ফেলেছেন। তাদের কারণে তো সারাদেশে রাস্তার অবস্থা মারাত্মকভাবে নাজুক।

অনেক দিন পর্যন্ত পবিত্র ছিল সাংবাদিকতা পেশা। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা। একেবারে হাল আমলে খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে, এক শ্রেণীর সাংবাদিক ভয়াবহরকম অনিয়ম দুর্নীতির মধ্যে নিমজ্জিত রেখেছেন নিজেদের। কোথায় যাবো? সবখানে ভেজাল।

এ পরিস্থিতিতে আত্মসমালোচনা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

আসুন না বুকে হাত রেখে চোখ বন্ধ করি। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিই। নিজেকে প্রশ্ন করি– আমি কি সৎ? সততা কি ধরে রাখতে পেরেছি?

ছয়.

বাংলাদেশ আর আমার মা। দুটোকে খুব ভালোবাসি। ঘরে ঘরে মায়েরা তাদের স্নেহের পুতুলকে ছড়া শেখান...আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

শিশুকালে মায়ের দুধ পান করেই তো বেড়ে উঠেছি। সেই দুধের কসম দিয়ে কোনো শিক্ষক, কোনো চিকিৎসক, কোনো প্রকৌশলী, কোনো সাংবাদিক অথবা যেকোনো পেশাজীবী কি বলতে পারবেন– আর দুর্নীতি করব না? অনিয়ম দুর্নীতি করলে আজ থেকে আমার পরিচয় হবে 'জারজ'।

শপথ করতে পারবেন?

(আবদুল মান্নান সম্পর্কিত রেফারেন্স : দৈনিক প্রথম আলো সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'ছুটির দিনে' ২২ অক্টোবর ২০০৫)

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক ও একজন মন্ত্রীর গল্প

দুটি খবর :

ক. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভা : শিক্ষককে অপসারণ, গবেষণা না করলে টাকা ফেরত দিতে ১৩ জনকে সতর্ক :

ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং স্টাডিজ বিভাগের হাজেরা বেগমকে সহকারী অধ্যাপক পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে অর্থ নিয়ে গবেষণা শেষ করতে না পারায় ১৩ জন শিক্ষককে সতর্ক করা হয়েছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে গবেষণা শেষ করতে না পারলে নিয়মানুযায়ী এসব শিক্ষককে অর্থ ফেরত দিতে হবে। নইলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন।

খ. ছাত্রীকে অশ্লীল প্রস্তাব : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে বাধ্যতামূলক ছুটি :

পরীক্ষায় পাস করানোর প্রলোভন দেখিয়ে এক ছাত্রীকে অশ্লীল প্রস্তাব দেয়ার অভিযোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মো: শাহ আলমকে বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়েছে সিন্ডিকেট। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক। উপাচার্য আবু ইউসুফ বলেন, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের মাস্টার্সের এক ছাত্রীকে পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অশ্লীল প্রস্তাব দেয়ার অভিযোগে প্রভাষক শাহ আলমকে এই শাস্তি দেয়া হয়েছে।

এক.

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছা কখনো ছিল না। তবে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষকদের প্রতি ছিল পদ্মাদীঘির মতো টইটম্বুর বিনম্র শ্রদ্ধা। কিন্তু গত দেড় দশকে যা হয়েছে তাতে শ্রদ্ধার থার্মোমিটারের পারদ অনেক নিচে নেমে গেছে। এখন এই মহৎ পেশায় ঢুকে গেছে অসততা, প্রবঞ্চনা, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, চৌর্যবৃত্তি আর ঘৃণ্য পলিটিক্স। ধরুন অনার্স মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। ভেবেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবেন। কিন্তু গুড়েবালি। শিক্ষক হওয়ার শর্ত ভালো রেজাল্ট নয়। এখন দেখা হয় প্রার্থীর পলিটিক্যাল পরিচয়। প্রার্থী ক্ষমতাসীনদের কতটা বিশ্বস্ত। ক্ষমতাসীন পার্টির জন্য বিগত সময়ে কী ভূমিকা ছিল। সব কিছু গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করেই নিয়োগ দেয়া হয়।

আবার ধরুন, এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। মনের ভেতর শপথের দাগ কাটলেন– যে করেই হোক ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। কিন্তু আপনি যদি ডিপার্টমেন্টের প্রভাবশালী শিক্ষকদের স্তুতি গাইতে না পারেন, তবে তাতেও গুড়েবালি।

দুই.

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন স্বজনপ্রীতির মহোৎসব। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের একজন সিনিয়র শিক্ষক। নামের আদ্যক্ষর আ। এই শিক্ষকের হাত ধরে একই বিভাগে নিয়োগ পেয়েছেন তার ভাই, ছেলে ও মেয়ের জামাই। এখন শিক্ষক হওয়ার পাইপ লাইনে আছেন তার আরো ক'জন স্বজন ও চাটুকার।

তিন.

পরিকল্পিতভাবেই কোনো কোনো শিক্ষক সন্তানকে ভর্তি করান নিজের বিভাগে। তারপর সেই সন্তানের নামে বরাদ্দ হয়ে যায় প্রথম শ্রেণীর এক,

দুই ও তিন নম্বর স্থানের যেকোনো একটি। পরে পরিকল্পনামাফিক সেই সৌভাগ্যবান সন্তানটি শিক্ষক পদে নিয়োগ পান। দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তানদের কেউ যদি শিক্ষক না হতে পারেন, তবে অন্য কৌশল নেয়া হয়। সন্তানটি মেয়ে হলে ভালো রেজাল্টধারী কাউকে মেয়ের জামাই বানিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই এখন বেয়ারা ষাঁড়। লাগামহীন। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে সব সময় মুখিয়ে থাকেন। আদর্শবাদীতার মোড়কে অনেকেই করছেন অন্ধ দলবাজি। পেশার প্রতি নেই ন্যূনতম দায়বদ্ধতা।

চার.

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়তে গিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। শিক্ষক নামধারী হিংস্র সাপের সঙ্গে সাপলুডুও খেলতে হয়েছে। দুরন্ত তারুণ্যের সেই সময়ে সাম্য সমাজবাদের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং প্রচণ্ড পুঁজিবাদবিরোধী ছিলাম। শুধু এ কারণে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার ভাইভা বোর্ডে অকথ্য, অবর্ণনীয়, ন্যাক্কারজনক, অমানবিক মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছি। কিন্তু শির নত করিনি কখনো। হিংস্র সেই মহৎ মানুষদের কারণে সেখানে মাস্টার্স করা হয়নি। ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বাধিক নাম্বার নিয়ে অর্জন করি এমএ ডিগ্রি। এত কিছুর পরও ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারে খুব একটা ক্ষতি হয়নি। কিন্তু সেই শিক্ষকদের ঘৃণ্য ভূমিকার কথা জেনে অনেকেই থুথু ছিটিয়েছেন।

পাঁচ.

নেড়িকুত্তার গায়ে লোম থাকে না। কিন্তু কেন? হোটেল বা রেস্টুরেন্টের পরিত্যক্ত তৈলাক্ত খাবার খেয়ে অনেক স্বাস্থ্যবান লোমশ কুকুর পরিণত হয় লোমহীন চামড়াসর্বস্ব প্রাণীতে। নেড়িকুত্তা নিজেও জানে, তেলমাখা খাবার খেলে শরীরে লোম থাকবে না। তবুও পথ পরিহার করে না। এক শ্রেণীর

শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সব কিছু জেনেও নিজেদের পেশাকে কলঙ্কিত করেন। তাদেরকে নেড়িকুত্তা বলা কতটা অযৌক্তিক?

ছয়.

জ্যৈষ্ঠ মাসের ভরদুপুর। বর্তমান সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর বাসায় খোশগল্পে ছিলাম। মন্ত্রী মহোদয়, মিসেস মন্ত্রী আর আমি। একেবারেই আন্তরিক আলাপন।

: স্যার, আপনি তো এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন...

: হ্যাঁ, সে তো অনেক আগের কথা।

: কিন্তু মহৎ পেশাটি ছাড়লেন কেন?

: সে এক লম্বা ইতিহাস। ঘৃণ্য দলাদলি আর মতান্ধ কিছু শিক্ষকের কারণে নাকে খত দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

: আবার কি সেই পেশায় যেতে ইচ্ছে হয় না?

এ কথা শুনে মন্ত্রী মহোদয় জানালার ফাঁক দিয়ে একদলা থুথু ছুড়লেন। সেই শব্দে জারুলগাছে বসে থাকা একটা কাক কা কা শব্দে চিৎকার করে উড়ে গেল।

অভিমানের হাইকু ও একটি অপমানের চারাগাছ

এক.

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো সময়টা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তুখোড় কর্মী ছিলাম। করেছি অগ্নিবীণা শিল্পী গোষ্ঠি, কথন আবৃত্তি সংসদ আর মুক্তির মঞ্চ। প্রতিটি সংগঠনই সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদবিরোধী। সাংস্কৃতিক চর্চা মানুষকে মানবতাবাদী করে তোলে এমন বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়। বিদ্রোহী কবির নাম যুক্ত ছিল বলেই কি না জানি না, এইসব সংগঠন করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকের অহেতুক, বেআইনি ও অনৈতিক কুনজরে পড়তে হয়েছে। বিপ্লবের ঝনাৎ অনুরণন ছিল বুকের ভেতর। সিম্ফনির মতো বাজত। তাই কোনো রক্তচক্ষু বা স্বার্থান্ধ চিন্তা পিছু টেনে ধরতে পারেনি কখনো। ছোট ছোট অনেক ঘটনা মনের মাঝে তীব্র আক্রোশ তৈরি করত।

এক দিনের ঘটনা।

কয়েকজন মিলে ক্লাসরুমে গান গাইছি। ইসলামিক শিক্ষা বিভাগের একজন শিক্ষক এসে ধমকের সুরে বললেন– এটা গানের জায়গা না, গাইতে হলে হলরুম ভাড়া করে গাও। ওই দিনের পর থেকে ওই শিক্ষককে আর কখনো সালাম দেইনি। তীব্র ঘৃণা থেকে। অনার্স ফাইনালের ভাইভায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করলেন এক শিক্ষক। দুই বছর পর সেই শিক্ষক ফোন করে প্রশংসায় ভাসিয়ে দিলেন আমাকে। বৈশাখী টেলিভিশনে আমার রিপোর্ট দেখে তিনি অভিভূত।

সৃষ্টি আর কষ্টের কী অদ্ভুত মিল! কষ্ট না থাকলে সৃষ্টি করা যায় না আবার সৃষ্টি করতে গেলে কষ্ট সইতেই হয়। এ জন্যই বুঝি, ঢাকা শহরের আশি শতাংশ উচ্চবিত্ত মানুষ মধ্যবিত্ত টানাপড়েনের সংসার থেকে জন্ম নেয়া।

মনের ভেতর জন্ম নেয়া ছোট্ট একটি অভিমানের চারাগাছ, একদিন ফুল-ফল শোভিত পাখিডাকা, ছায়াঢাকা মহীরুহ হতে পারে। তাই অপমানে ভয় পেতে নেই। আমার তরুণ বন্ধুদের বলছি, থেমে যেয়ো না, হাল ছেড়ো না, আর কটুবাক্যকে পরোয়া কোরো না। বরং হে কমরেড, বুকের বোতাম খুলে আলিফের মতো দাঁড়িয়ে থাকো। সহস্র অপমানের হাওয়া লাগুক উন্মুক্ত বুকে এবং বলতে থাকো– আমিই পারি। পশ্চিম বাংলার জনপ্রিয় একজন কবি লিখেছেন– আমি মানুষের সামনে কুকুর হয়ে বসে থাকি, তার ভেতরের কুকুর দেখবো বলে।

দুই.

'তারে জামিন পার' বলিউডের অস্কারজয়ী বিশ্ববিখ্যাত ছবি। ছবিটি যারা দেখেছেন তারা নিশ্চয় জানেন। ছোট্ট ইশানকে শিক্ষকদের অজস্র অপমান সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তার মনের ভেতর নিত্যপ্রহর জ্বলে থাকত সাহসের জোনাকপোকা। তাই হার না- মানার দুর্দান্ত এক নজির রেখেছিল প্রতিবন্ধী ছেলেটি। বার্ষিক চিত্রাঙ্কনে ঠিকই সে দেখিয়ে দিলো, সবাইকে জানিয়ে দিলো ইশানই সেরা।

তিন.

সংস্কৃতির চর্চা করতাম, তাই কোনো কোনো শিক্ষক মনে করতেন আমার ভবিষ্যৎ একেবারেই নাখাস্তা। আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠনে শিক্ষকদের দু-চারজন ছেলেও আসত শিশু বিভাগে কাজ করার জন্য। তবে প্রতি বছর নতুন সংস্কৃতিকর্মী তৈরির একটা তাগদা থাকত সবার মধ্যে। আমাদের এক সিনিয়র কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হলে তিনি রীতিমতো হুমকি দিলেন–

– আমার ছেলেকে নষ্ট করার দায়ভার কি তোমরা নেবে? লেখাপড়া নেই গান-বাজনার ধান্ধা। ওসব দিয়ে কী হবে?

এ ঘটনা আমাকে জানাল ওই সহকর্মী। আমি সোজা বলে দিলাম, আর কখনো ওই শিক্ষকপুত্রকে ডাকবেন না যদি আপনি পুরুষ হন। কয়েক দিন পর ওই শিক্ষক নিজেই আমাদের ডেকে পাঠালেন। কিন্তু আমরা গেলাম না। শেষে ফোনে জানালেন– বাবারা, আমার ছেলেটা তো উচ্ছন্নে যাচ্ছে, দ্যাখো একটু সোজা পথে আনতে পারো কি না!

ওই শিক্ষকের অপমানটুকু এখনো হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধে আছে। কখনো স্যারের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম– উচ্ছন্নে তো যাইনি। এ দেশের ইতিহাস নির্মাণের রাজমিস্ত্রি হয়েছি। হারিয়ে যাইনি বর্ষার নতুন জলের মতো। বরং প্রতিদিনই মাটির গভীরে প্রোথিত হচ্ছে অস্তিত্বের শেকড়।

ওই অপমানই আশীর্বাদ হলো। সে দিন সহকর্মীর চোখে জল দেখে শপথ নিয়েছিলাম– সাংস্কৃতিক কর্মীদের বড় হতেই হবে। যথার্থ মানুষ হতে হবে। তবে ওসব হতে না পারি, অনির্বাণ চেষ্টা তো করছি। কবিদের নাকি কষ্ট না থাকলে কাব্য আসে না– পুরোনো এ কথাই আবার সত্য হয়ে ধরা দিলো।

চার.

জাপানে তিন লাইনবিশিষ্ট অর্থহীন এক ধরনের কবিতা আছে। এগুলোকে বলা হয় হাইকু। আমি বলব, অভিমান হলো হাইকুর মতো, অর্থহীন। অভিমান করে কোনো লাভ নেই।

আমার বন্ধু রাশেদ। বুকের মধ্যে পদ্মাদীঘির মতো টইটম্বুর অভিমান। শিক্ষকদের সামান্য নেতিবাচক মন্তব্যও তার অসহ্য। ও সব সময় বলত, আজ আমরা যতটা পারছি, অনেক শিক্ষক হয়তো আমাদের বয়সে এতটুকুও পারতেন না। বন্ধুটা অনার্স ফাইনাল না দিয়েই ক্যাম্পাস ছেড়েছিল। অনেক দিন তার কোনো খোঁজখবর পাইনি।

অর্ধযুগ পর তার সাথে হঠাৎ একদিন দেখা। আমি তো অবাক। তার চার পাশে চারজন। তাও আবার সশস্ত্র। টাই, স্যুট। অসাধারণ। চেনাই যায় না। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরল ও। তারপর বলতে লাগল তার সাফল্যগাঁথার কথা।

– দেখ অনেক স্ট্রাগল করেছি। নিজ হাতে কোম্পানিটা গড়েছি। এখন আমার এখানে সাড়ে পাঁচ হাজার লোক কাজ করে। পাশাপাশি প্রাইভেটে অনার্স-মাস্টার্সও করে নিয়েছি।

আমি তো থ। নিজের জীবন তো রেভ্যুলেশন করে ফেলেছিস।

–দোস্ত আসলে আমি ছিলাম খুব অভিমানী, তোরা তো জানিস। এর জন্য অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। শোন, নিজের ভাগ্যকে নিজেই গড়তে হয়। আমিই তার প্রমাণ। অভিমান করলে নিজেরই ক্ষতি। কোনো পুরুষ অভিমান করে তারুণ্যকে গুডবাই জানাতে পারে না।

- বাহ, তুই তো দেখি রতন স্যারের মতো সাহিত্যিক হয়ে গেছিস।

- তার জন্যই তো ভার্সিটি ছাড়তে হয়েছিল।

শোন রতন স্যারের এক ছেলে আর এক ভাতিজা আমার কোম্পানিতে চাকরি করে। আমি তাদের প্রতি মাসে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা করে বেতন দিই।

কতিপয়ের জন্য সামগ্রিক অধঃপতন গ্রহণযোগ্য নয়

এক.

দুটো ধাঁধা দিয়ে শুরু করি।

এক : সিগারেট ও ভালোবাসার মধ্যে মিল কোথায়?

দুই. মাইক ছাড়া আস্তে বললেও কখন জোরে শোনা যায়?

এই দুটো ধাঁধা নিয়ে খানিক চিন্তা করুন। আর এ কথা বলে রাখা ভালো ধাঁধা দুটো আমি ধার করেছি। এর উত্তর এ গদ্যের শেষ প্রান্তে উপস্থাপন করব।

দুই.

একটা উক্তি প্রায়ই শোনা যায়। দুধের মধ্যে একফোঁটা টক পড়লে সবটুকু নষ্ট হয়ে যায়। কতিপয় স্টুপিড শিক্ষকের কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সামগ্রিক অধঃপতন শুরু হয়েছে।

২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ ইউনিটে যথানিয়মে ভর্তি পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলও প্রকাশ করে ঢাবি কর্তৃপক্ষ। পরে অ্যাকাডেমিক কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, পুনরায় পরীক্ষা নেয়া হবে। কারণ প্রশ্নপত্রে ছয়টি ভুল ছিল। এ কারণে মূল্যায়ন যথাযথ হয়নি বলে দাবি তাদের। কিন্তু প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রশ্নপত্রে ছয়টি ভুল হলো, অথচ সেটি উদঘাটনের পদক্ষেপ নিলেন না দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষক। পুনরায় পরীক্ষা নেয়ার ঘোষণা দিয়ে তার দায় চাপালেন ছাত্রদের ওপর।

গোবেচারা শিক্ষার্থীরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। পুনরায় ভর্তি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে রিট করলেন তারা। বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দীন চৌধুরী ও বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনের ডিভিশন বেঞ্চে

শুনানির পর আদেশ দেয়া হলো। আদালতের পর্যবেক্ষণে জানা গেল, গ ইউনিট অর্থাৎ বাণিজ্য অনুষদের ডিন মহোদয় এই ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে বড় ধরনের বাণিজ্য করেছেন। কয়েকটি কোচিং সেন্টারের সহযোগিতায় তিনি প্রশ্নপত্র তৈরি করেছেন। ছয়টি ভুলের জন্য তাকেই দায়ী করলেন হাইকোর্ট। ডিন মহোদয়কে অব্যাহতিও দেয়া হলো।

বাণিজ্য অনুষদের ডিন সাহেব একজন প্রফেসর। দীর্ঘ শিক্ষকতার পরই তিনি এই পদে আসীন হয়েছেন। এরপর, সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকদের ভোটে তিনি ডিন নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, এই প্রফেসরকে কী উপাধি দেয়া যায়? এর ভার আপনাদের ওপর দিয়ে রাখলাম। এই শিক্ষকের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অন্য সবার মাথা কি নিচু হয়নি? কিন্তু অধপতনের স্রোতে বাধা দিতে কেউ এগিয়ে আসছে না। প্রতিবাদ নেই, সমালোচনা নেই, সবাই একেবারে নিশ্চুপ। সবার চোখেই যেন রঙিন চশমা। কেউ দেখতে পাচ্ছেন না পঁচে যাওয়া শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতগুলো। কিন্তু কতিপয় শিক্ষকের অপকর্ম বা অপরাধ বা অসততার দায়ভার সবার নয় এ কথা দিনের মতো সত্য। তবে অন্যায় মেনে নেয়াকে যদি অপরাধ বলি, তবে মানুষ গড়ার এই কারিগরদের সবাইকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকেই পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন। কিন্তু নানা কারণে সে চেষ্টা সার্বজনীন রূপ পাচ্ছে না। পরিবর্তনের সেই ঢেউ মৃদু। এর আঘাত লাগছে না, বটবৃক্ষের মতো শিক্ষাঙ্গনের সর্বস্তরে প্রোথিত অন্যায়ের ওপর।

তিন.

দুই ধরনের দুটো খবর। একটি ১২.১২.২০১১ তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠায় এসেছে। অপরটি ৩০.১২.২০১১ তারিখে দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়। প্রথম খবরের শিরোনাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বই পড়তে বাধ্য করছেন শিক্ষক। মূল খবর হলো, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মু. মনজুর আহসান কয়েক বছর ধরে শিক্ষার্থীদের দুটি বই পড়তে বাধ্য করছেন। এগুলো হলো : সাজ্জাদ হোসায়েনের 'একাত্তরের স্মৃতি' এবং শর্মিলা বোসের 'ডেড রিকনিং : মেমরিস অব নাইনটি সেভেনটিওয়ান বাংলাদেশ ওয়ার'। এ দুটো বই মুক্তিযুদ্ধের পুরোপুরি চেতনাবিরোধী বলে রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন রিপোর্টার।

দ্বিতীয় খবরটিও ইতিহাস বিভাগের এক শিক্ষককে নিয়ে। তবে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের। তিন ছাত্রীকে বোরকা পরার অপরাধে তিনি ক্লাসরুম থেকে বের করে দিয়েছেন। এ কাজটি করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো মুক্ত চেতনার জায়গায় গুরুতর অপরাধ করেছেন বলে অনেকে নিন্দাও জানিয়েছেন। হাইকোর্ট ইতোমধ্যে রায় দিয়েছে যে, কাউকে বোরকা পরতে যেমন বাধ্য করা যাবেনা, তেমনি বাধাও দেয়া যাবেনা। সে বিবেচনায় ওই শিক্ষকের আচরণ আদালত অবমাননার শামিল।

চার.

দুজন শিক্ষকই স্টুপিড। একজন রাষ্ট্রদ্রোহী, স্বাধীনতাবিরোধী, আরেকজন ধর্মদ্রোহী।

পাঁচ

বদরুদ্দীন উমর। যারা নিয়মিত পত্রিকা পড়েন অথবা সামান্য হলেও রাজনীতি সচেতন, তারা তাকে না চেনার কথা নয়। এক সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। পাকিস্তান আমলের কথা। শুধু স্বাধীনতার পক্ষে লিখতেন বলে মোনায়েম সরকার তাকে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাধ সাধেন তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক শামসুল হক।

তার হস্তক্ষেপের কারণে সে যাত্রায় চাকরি রক্ষা পায়। কিন্তু স্বাধীনচেতা বদরুদ্দীন উমর এ ঘটনায় ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। ১৯৬৮ সালে এ পেশা ছেড়ে দেন। পুরোদস্তুর লেখালেখিতে মনোযোগ দেন তিনি। একটি লেখায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তচিন্তার মানুষদের জায়গা নয়।

অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি বলে অধ্যাপনা পেশা ছেড়ে দেয়ার মতো দুঃসাহস করেছেন বদরুদ্দীন উমর।

ছয়.

২০.১২.২০১১ তারিখে দৈনিক সমকালের তৃতীয় পৃষ্ঠায় তিন কলামজুড়ে একটি খবর বেরিয়েছে। শিরোনাম : নানা অপকর্মে জড়িয়েছেন শিক্ষকরা! খবরটি অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে নয়, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকদের যৌন হয়রানি, আত্মসাৎ, ভর্তি ও কোচিং বাণিজ্য নিয়ে।

রিপোর্টের শেষ প্রান্তে শিক্ষকদের অধঃপতনের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের মতামত চাওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষকরা সমাজের

সবচেয়ে সম্মানিত অংশ। তাদের কাছে অনৈতিক কিছু আশা করা হয় না। তাদের আচরণ থেকে নতুন প্রজন্ম শিখবে। অনিয়ম, দুর্নীতি বা সব রকম অসম্মানের পথ থেকে সরে আসা তাদেরই দায়িত্ব। তিনি বলেন, শিক্ষকতা পেশায় ঢুকে পড়া কিছু কুলাঙ্গারের কারণে শিক্ষক সমাজের সম্মানহানি ঘটছে। ছাত্রীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। এ ধরনের ঘটনায় কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। তাদের শাস্তি পেতে হবে।

সাত.

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের শিক্ষক (!) পরিমল জয়ধর। যে কুলাঙ্গারটি নিয়মিত এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করত। ঘটনা প্রকাশ করলে ধর্ষণের ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে প্রতিনিয়ত ব্লেকমেইল করত যে স্টুপিড, তার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের। পরিমল স্কুলের শিক্ষক। স্ট্যাটাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে নিচের গ্রেডের। বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় প্রতিদিনই পরিমলরা জন্ম নিচ্ছে। এরা মুখোশধারী। আসলে এরা শিক্ষক নয়, হিংস্র পশুদের প্রেতাত্মা।

আট.

বধির স্কুলে কখনো কি গিয়েছেন অথবা দেখেছেন? এ বিষয়ে যদি অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে একদিন সময় করুন। ঢাকার পুরানা পল্টনের বিজয়নগর পানির ট্যাংকির পাশে বধির স্কুলে আসুন। এত হৈচৈ, শব্দদূষণ, অস্থিরতা, যানজটের শহরে যেন অদ্ভুত এক নীরব প্রাঙ্গণ। তবে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে, মূকাভিনয় করছে একদল মানুষ। কিন্তু না। তারা সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছে। বোবাদের ঝগড়া আরো ইন্টারেস্টিং। কোনো সচেতন মানুষ যখন চুপ থাকেন, তখন বলা হয় বোবা হয়ে গেছেন। কিন্তু বোবারাও তো প্রতিনিয়ত কথা বলেন সাংকেতিক ভাষায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম, অসঙ্গতির খবর প্রতিনিয়ত ছাপা হচ্ছে পত্রিকায়। কিন্তু কই? কোনো প্রতিকার নেই! সবাই জন্মবধির হয়ে গেছেন। সাংকেতিক ভাষাও ভুলে গেছেন। শিক্ষকদের মধ্যে নীতিবানরাও কেমন মিইয়ে গেছেন। শীতনিদ্রায় গেছেন তারা। কে করবে প্রতিবাদ! কে বাঁধবে ঘণ্টি? কিন্তু কতিপয়ের জন্য সামগ্রিক অধঃপতন কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। এর সামগ্রিক ও সার্বজনীন প্রতিবাদ দরকার। নইলে আগামী প্রজন্মের সামনে ঘোর অন্ধকার।

নয়.
ধূমপানে বিষপান। খুব পরিচিত একটা কথা। ধূমপানের ক্ষতিটা তাৎক্ষণিক হয় না, হয় ধীরে ধীরে। নতুন একটা ফিলিংস আর বাহাদুরি দেখাতেই তরুণ প্রজন্ম সিগারেট শুরু করে। সাপের বিষের মতো এই বিষ দু-এক ঘণ্টায় ক্ষতি করে না।

এই গদ্যকথনের শুরুতে দুটো ধাঁধা দিয়ে রেখেছিলাম। উত্তর পেয়েছেন কি? না পেলে বলছি।

ভালোবাসা এবং সিগারেটের মধ্যে মিল হলো দুটোই হৃদয় পোড়ায়। শিক্ষাঙ্গনে অনৈতিকতার কারণে আমাদের প্রজন্ম ভালোবাসা এবং সিগারেটের মতো পুড়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

মাইক ছাড়া যখন আস্তে শব্দটি চিৎকার করে বলা হয়, তখন জোরে শোনা যায়। আমাদেরকেও বিনয়ের সাথে অনেক জোরে চিৎকার করে শিক্ষাঙ্গনের অনিয়মের কথাগুলো বলতে হবে।

একটু হলেও প্রতিবাদ করুন। নইলে শুধু রাজনীতিকদের সন্তানরা নন, আমরাই নষ্ট হয়ে যাব। রাজনীতিকরা তো নিজের ছেলেদের বিদেশে পাঠিয়ে শিক্ষাজীবন নির্বিঘ্ন রেখে অন্যের ছেলেদের দিয়ে রাজনীতির খেলা করেন।

ভালো থাকুন।

রেফারেন্স

লেখকের নানা কর্মতৎপরতা
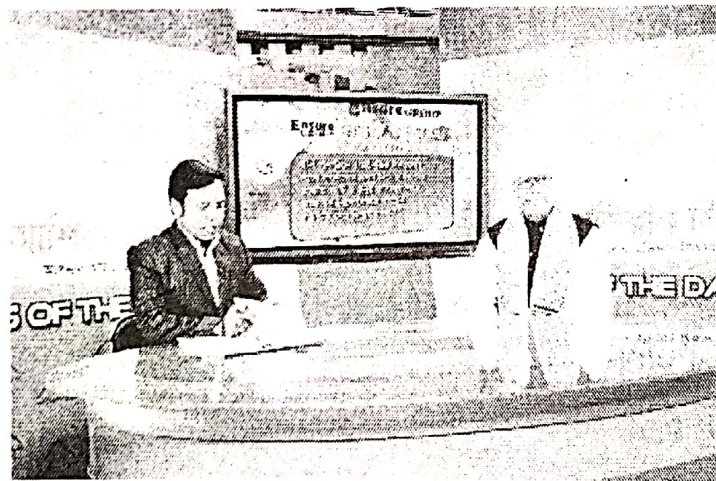
ASIAN UNIVERSITY OF BANGLADESH

তারিখ: ২২-১১-২০১১ ইং

আমিরুল মোমেনীন মানিক
বিশেষ প্রতিনিধি, দিগন্ত টিভি
পুরানা পল্টন, ঢাকা।

বিষয়: অতিথি শিক্ষক হিসেবে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এ আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে।

জনাব

আপনাকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ সু-শিক্ষিত ও যোগ্য নাগরিক তৈরীর পাশাপাশি সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, বাংলার সংস্কৃতি লালন এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়নের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলছে। উন্নত শিক্ষা, মেধার বিকাশ ও একঝাঁক শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ অন্যতম। তারই ধারাবাহিকতায় দেশে এই প্রথম "Certificate Course on Print & Broadcast Journalism" শিরোণামে একটি কোর্স চালু করার উদ্যোগ হাতে নিয়েছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

এই আয়োজনকে আরো সমৃদ্ধ ও গতিশীল করতে একজন নিয়মিত অতিথি শিক্ষক হিসেবে আপনার পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে

22/11/2011

মোঃ [illegible]
রেজিস্ট্রার
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

Main Campus : House 9, Road 5, Sector 7, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Tel : 8916116, 8912366, 8922992, 8950729, Fax : (880-2) 8916521
Dhanmondi Complex : House 36, Road 27 (Old), 16 (New), Dhanmondi R/A, Dhaka-1209, Tel : 9132256, 9134777, 9135608
Motijheel Complex : 28/1, Toyenbee Circular Road, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Mobile : 01711469153, 01552573225
Rajshahi Campus : House C/691, Birshreshtha Shahid Jahangir Sarani, Talaimari, Kazla, Rajshahi, Tel : (0721)751211, (0721) 751459, 01711-831872
Khulna Campus : 33, KDA Avenue (Near Hotel Royal), Khulna, Tel : 041-811141, Mobile : 01712-115891, 01712-163900
E-mail : info@aub-bd.org, Website : www.aub-bd.org

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০১১

লেন (২২বিপণন প্লট), বাংলামটর রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন: ৮৬৩৫১৮১ (নিউজ) ৮৬১৮০৩৮ (বিজ্ঞাপন) ৮৬৫৩৩১৬ (সার্কুলেশন) ফ্যাক্স: ৮৬৩৫১

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের অননুমোদিত ছুটির প্রবণতা বাড়ছে

মহিউদ্দিন মাহী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে দেশের বাইরে শিক্ষাছুটির কারণে ২০৫ জন শিক্ষক চাকরি হারিয়েছে। তবে প্রকৃত অবস্থা আরো ভয়াবহ। চাকরিচ্যুতি ও অবৈধ ছুটির প্রবণতা সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭২-এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১২৩ জনকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। প্রথম দফায় ১০৯, দ্বিতীয় দফায় ৭ ও সর্বশেষ গত বছর ডিসেম্বরের ৮ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভায় ৭ শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে চাকরিতে যোগ দেয়া এক শিক্ষককে সতর্ক করা হয়। আর শিক্ষাছুটিতে আছে প্রায় ৩৯৬ জনেরও বেশি। এর পর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯১-এর পর থেকে অবৈধভাবে ছুটি নিয়ে বিদেশে

দুই শতাধিক চাকরিচ্যুত

অবস্থানের দায়ে ৭৪ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সর্বশেষ চলতি মাসের ১ তারিখ সিন্ডিকেট বৈঠকে শিক্ষক জয়নাল আবেদিন চাকরিচ্যুত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১০ জন টাকা পরিশোধ করেছে। তাদের টাকার পরিমাণ ২২ লাখেরও বেশি। এছাড়া গাজিপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ৭ জন শিক্ষককে একই কারণে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সর্বশেষ গত বছরের খোন্দকার দেলোয়ারের ছেলেকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এর আগে ২০০৭-এর পর বিভিন্ন সময় ৬ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতি এক শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দা ফাহলিজা বেগম ছুটি নিয়ে লন্ডন যান। নির্ধারিত ছুটি শেষ হওয়ার পরও তিনি দেশে না ফেরায় তাকে চাকরি এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। চাবি সূত্র, উল্লিখিত ১২৩ জনের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা এক কোটি ৪৩ লাখ ২৫ হাজার ৯৯১ টাকা। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ৩১ জন শিক্ষক ৫৬ লাখ ৮০ হাজার ৯৫৬ টাকা পরিশোধ করেছেন।

এদের কাছ থেকে টাকা আদায়ে কর্তৃপক্ষ ১০৯ শিক্ষকের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে টানিয়ে দেয়। এদের মধ্যে ৩১ জন শিক্ষক টাকা পরিশোধ করায় তাদের নাম ওয়েবসাইট থেকে মুছে দেয়া হয়। এদের মধ্যে ৭৫ জন শিক্ষক কে কোথায় আছেন তার খোঁজ জানে না কর্তৃপক্ষ। তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা এক কোটি ৪৩ লাখ ২৫ হাজার ৯৯১ টাকা। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিধি অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা রয়েছে তা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, কজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে টাকা পরিশোধ করেছেন, বাকিরাও টাকা পরিশোধ করবেন বলে আমার বিশ্বাস। জাহেদ

৬ বছর পর

আদালতের রায়ে প্রথম শ্রেণী

সমকাল
মঙ্গলবার
২০ ডিসেম্বর ২০১১ ৬ পৌষ ১৪১৮

নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছেন শিক্ষকরা!

■ সমকাল প্রতিবেদক

জ্ঞানচর্চার পাদপীঠ হিসেবে পরিচিতি থাকলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকরা নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়ছেন। শিক্ষার্থী ও নারী সহকর্মীদের সঙ্গে অসদাচরণ, যৌন হয়রানি, প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ, ভর্তি বাণিজ্য, নিজ কোচিং সেন্টারে পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের চাপ প্রয়োগ, ক্লাসে নির্বিচারে ছাত্রছাত্রীদের মারধর করা ছাড়াও বহুবিধ অভিযোগের তীর তাদের বিদ্ধ করছে। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের নানা অভিযোগ সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এসব অভিযোগের কোনো সুরাহা না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষুণ্ন হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কও। সরকারি তদন্তে দেখা গেছে রাজধানীর একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সমস্যা প্রকট হয়েছে।

ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিসার মো. আবদুস ছামাদ

সমকালকে বলেন, গত দুই মাসে কেবল রাজধানীরই কমপক্ষে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে কয়েকটির তদন্ত শেষ হয়েছে। বাকি কয়েকটির তদন্ত শিগগির শুরু হবে। এর বাইরেও তাদের কাছে অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) ডিআইএর পরিচালক অধ্যাপক ড. [illegible] হক সমকালকে বলেন, আগের চেয়ে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ বেড়েছে। গত দুই মাসে সারাদেশে সরেজমিন তদন্ত করে তারা ১৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছেন। এর মধ্যে রাজধানীর রয়েছে ৭টি এবং নারায়ণগঞ্জের ৩টি।

ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিস থেকে জানা গেছে, গত দুই মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

নানা অপকর্মে জড়িয়ে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তারা তদন্তের নির্দেশ পেয়েছেন সেগুলো হলো– সিভিল এভিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয়, বিসিএসআইআর স্কুল, খালেদ হায়দার মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, যাত্রাবাড়ীর মুরাদপুর সখীরন নেছা হাই স্কুল, ডেমরার মান্নান উচ্চ বিদ্যালয়, কামরাঙ্গীর চরের ওয়াদি উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, ধামরাইয়ের নবযুগ ডিগ্রি কলেজ, মানিকগঞ্জের মডেল হাই স্কুল, খিলগাঁওয়ের ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট এবং মীরপুরের বিসিআইসি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আর্থিক ও প্রশাসনিক নানা অনিয়ম এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উঠেছে। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ রয়েছে। ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউটে দেয়াল ধসে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের প্রাণহানি এবং বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বিসিআইসি কলেজে সরকারি তদন্ত হয়। শিক্ষা কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অনৈতিক আচরণের অভিযোগ অহরহ আসছে। এর মধ্যে সরকারিভাবে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুলের বসুন্ধরা শাখার বাংলা বিষয়ের শিক্ষক পরিমল জয়ধর, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বনশ্রী শাখার গণিতের শিক্ষক মতিয়ার রহমান এবং লালবাগের ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন) মোঃ আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে। ক্লাসে নির্বিচারে শিক্ষার্থীদের মারধর করে সম্প্রতি দুর্নাম কামিয়েছেন সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ব্রাদার প্রশান্ত ডি কস্টা এবং রামপুরা থানাধীন উলন এলাকার খালেদ হায়দার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক খালেক মজুমদার। অথচ সরকারি-বেসরকারি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ওপর সব ধরনের শাস্তি নিষিদ্ধ করে সরকার একটি নীতিমালা ও প্রজ্ঞাপন জারি করে গত ২১ এপ্রিল। এতে বলা হয়, ক্লাসরুমে শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও কোনো শিক্ষার্থীকে হেয় প্রতিপন্ন বা আঘাত করা যাবে না। তবে বাস্তবে এর কোনো প্রতিফলন নেই। খালেদ হায়দার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক খালেক মজুমদার গত মাসে ক্লাসে দুষ্টুমির অভিযোগে একনাগাড়ে একই ক্লাসের ৩৭ শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন। এ ঘটনার কয়েক দিন আগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করার অভিযোগ ওঠে রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ব্রাদার প্রশান্ত ডি কস্টার বিরুদ্ধে। অভিভাবক ইয়াম মোহাম্মদ অভিযোগ করেন, ওই শিক্ষক তার ছেলে সপ্তম শ্রেণীর দিবা শাখার ছাত্রকে নির্মমভাবে পিটিয়ে সিঁড়ি থেকে ফেলে দেন। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ এ অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে। চলতি বছরের ১৫ মে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বনশ্রী শাখার চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী নিলভীকে মারাত্মকভাবে প্রহার করে তার হাত ভেঙে দেন শিক্ষক বেলায়েত হোসেন।

ক্লাসে অনৈতিক আচরণ এবং শিক্ষার্থীদের মারধর করার অভিযোগে ১৩ আগস্ট বরখাস্ত করা হয় ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক আবদুল হাকিমকে। ঢাকার জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আবদুস ছামাদ ও সহকারী পরিচালক নাজমা খান সরকারিভাবে বিষয়টি তদন্ত করেন। জেলা শিক্ষা অফিসার সমকালকে জানান, গত এপ্রিল মাসে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তাকে মারধর করার অভিযোগ দায়ের করে। বালিকা শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক বিষয়টি প্রধান শিক্ষককে জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে ষাটোর্ধ্ব বয়সী ওই শিক্ষককে বালক শাখায় বদলি করা হয়। তিনি বালক শাখায় বদলি হয়ে যাওয়ার পরপরই নবম শ্রেণীর একাধিক ছাত্রী তার বিরুদ্ধে অশালীন আচরণ ও গায়ে হাত দেওয়ার অভিযোগ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের নির্দেশে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে।

মাউশি মহাপরিচালকের কাছে পাঠানো জেলা শিক্ষা অফিসের তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, তেজগাঁও থানা এলাকার সিভিল এভিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) রতন কুমার পাল স্কুলের দিবা শাখার শিক্ষিকা লিপি বণিককে দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত করে আসছিলেন। অশালীন ও অশ্লীল আচরণ, কথাবার্তাসহ বিভিন্নভাবে অঙ্গভঙ্গি করে উত্ত্যক্ত করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেও ফল না পেয়ে তিনি মাউশি মহাপরিচালকের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। মহাপরিচালক ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিসারকে তদন্তের দায়িত্ব দেন। শিক্ষা অফিসার সুদীর্ঘ তদন্ত শেষে শিক্ষক রতন কুমার পালকে অভিযুক্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন।

বিশেষজ্ঞ অভিমত : শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সরকারি তদন্তে প্রমাণিত হওয়া এসব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রাথমিক শিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী সমকালকে বলেন, শিক্ষকদের মধ্যে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটছে। আগে তাদের দ্বারা সংঘটিত নানা অঘটন স্থানীয়ভাবেই ধামাচাপা দেওয়া হতো, বর্তমানে গণমাধ্যমের কারণে তা প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতে ত্রুটির কারণে উচ্চমূল্য দিয়ে অনেকে চাকরিতে আসছেন। তাদের কাছে নৈতিকতা আশা করা বৃথা। রাশেদা কে চৌধুরীর মতে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার করা এবং শক্ত মনিটরিং ব্যবস্থা থাকলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ সমকালকে বলেন, শিক্ষকরা সমাজের বাইরের কেউ নন। সামাজিক অধঃপতনের ঢেউ তাদের গায়েও লাগছে। যে কোনো মূল্যে বিত্তশালী হওয়ার প্রবণতা তাদেরও গ্রাস করছে। অর্থের বিনিময়ে ও রাজনৈতিক অনাচারের কারণে শিক্ষকতা করার অনুপযুক্ত কিছু লোক এ পেশায় ঢুকে পড়েছে। তিনি বলেন, 'নিয়োগ পদ্ধতির সংস্কার' এবং 'শিক্ষকদের জন্য আচরণ বিধিমালা' (কোড অব কন্ডাক্ট) তৈরি করা গেলে এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে।

সরকারের বক্তব্য : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, শিক্ষকরা সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত অংশ। তাদের কাছে অনৈতিক কিছু আশা করা হয় না। তাদের আচরণ থেকে নতুন প্রজন্ম শিখবে। অনিয়ম, দুর্নীতি বা সব রকম অসম্মানের পথ থেকে সরে আসা তাদেরই দায়িত্ব। তিনি বলেন, শিক্ষকতা পেশায় ঢুকে পড়া কিছু কুলাঙ্গারের কারণে শিক্ষক সমাজের সম্মানহানি ঘটছে। ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিরাপদ হয়ে পড়ছে। এ ধরনের ঘটনায় কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। তাদের চরম শাস্তি পেতে হবে।

আজকালের খবর

জবির অধ্যাপক নিয়োগে শর্ত শিথিল রাজনৈতিক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি

● মাহবুব মমতাজী, জবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারে যে শর্ত ছিল তা শিথিল করেছে প্রশাসন। রাজনৈতিক বিবেচনায় অভ্যন্তরীণ সহযোগী অধ্যাপকদের পদোন্নতি দেয়ার জন্যই

জবির অধ্যাপক নিয়োগে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এটি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে তারা শিক্ষার মান নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, প্রভাবশালী কিছু শিক্ষকের চাপে সার্ভিস রুলস কমিটির পরামর্শ ছাড়াই গত ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় কোনো শ্রেণীতে বা ক্যাটাগরিতে শর্ত শিথিল করা হবে তা উল্লেখ না করে এ সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা জানান, প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তের ফলে রাজনৈতিক বিবেচনায় দলীয় শিক্ষকরা অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ার সুযোগ পাবে। অধ্যাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে মানদণ্ডগুলো উল্লেখ করা হয় তা হলো— ওই পদের প্রার্থীদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাণ্ডিত্য থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর যে কোনো একটিতে ন্যূনতম সিজিপিএ তিন দশমিক আট অথবা প্রথম শ্রেণীসহ শিক্ষাজীবনে ন্যূনতম দুটি প্রথম বিভাগ/শ্রেণী/জিপিএ তিন থাকতে হবে। স্বীকৃত জার্নালে ন্যূনতম ১০টি প্রকাশনা থাকতে হবে। আর সহযোগী অধ্যাপক পদে থাকাকালীন সময়ে ন্যূনতম চারটি প্রকাশনা থাকতে হবে। প্রার্থীদের স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনতম ২০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক পদে ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। একই ক্ষেত্রে এমফিল ডিগ্রিধারীদের ন্যূনতম ১৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক পদে ছয় বছরের, পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের ন্যূনতম ১২ বছরের, সহযোগী অধ্যাপক পদে ন্যূনতম ৪ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এগুলোর মধ্যে আসলে কোনো ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়েছে তা স্পষ্ট না করায় ঢালাওভাবে সুবিধা দেয়ার সুযোগ থাকবে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী সাইফুদ্দিন, দর্শন বিভাগের ড. নূরুল মোমেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. অরুণ কুমার গোস্বামী, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাইফুল ইসলাম অধ্যাপক নিয়োগের নীতিমালা সংশোধনের আবেদন করেন। তাদের আবেদন যাচাই না করে উপাচার্য বিষয়টিকে সমর্থন করে সিন্ডিকেট সভায় উপস্থাপনের সুপারিশ করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়ার ক্ষেত্রে শর্ত শিথিল করা হয় না। শুধু আমাদের এমন সিদ্ধান্ত প্রথম ঘটলো। তিনি আরো জানান, শর্ত শিথিলের ক্যাটাগরি নির্দিষ্ট না করায় যাকে ইচ্ছা তাকে পদোন্নতি দেয়ার সুযোগ থাকবে।

এর কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, যারা এ শর্ত শিথিলের জন্য আবেদন করেছেন তারা সংশ্লিষ্ট পদে পদোন্নতির পাওয়ার আবেদন করেছেন। বিদ্যমান শর্ত অনুযায়ী তাদের আবেদন করার যোগ্যতা নেই। তাই এর সহজ প্রক্রিয়া বের করার জন্য এ রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেন।

বিভিন্ন বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা জানান, শর্ত শিথিল করা হলে শুধু শিক্ষার মানই নষ্ট হবে না, একই সঙ্গে রাজনৈতিক বিবেচনায় অধ্যাপক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এটি শিক্ষকদের মধ্যে অস্থিতিশীল পরিবেশ ও হতাশা টেনে আনবে। কৃত্রিমভাবে পদ সৃষ্টি করে অধ্যাপক পদ পূরণ করার মাধ্যমে দেশ-বিদেশে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, অভ্যন্তরীণ শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা দিতে হয়। কারণ তারা এখানে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন।

ঢাবিতে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে যা হচ্ছে–

এসে একজন শিক্ষার্থী প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. জিল্লুর রহমানের কাছে অভিযোগ পেশ করেছেন। ওই শিক্ষার্থীর নাম ইশতার মহল। ১১ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট বরাবর আবেদনটি করা হয়। তিনি একই বিভাগের ৮ম ব্যাচের বিবিএ ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী ও দু'টিতেই প্রথম হলেও তাকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ওই শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের ৮ম ব্যাচের বিবিএ এবং এমবিএতে যথাক্রমে ৩.৯৪ ও ৪ সিজিপি পান। এছাড়া তিনি ১৯৯৯ সালে এসএসসিতে ৭০৬ পেয়ে প্রথম বিভাগ এবং ২০০১ সালে ৮৯৯ পেয়ে প্রথম বিভাগ পান। তিনি ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে দু'টি পরীক্ষাতেই অংশ নেন। ২০০৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর প্রথম দফায় এবং চলতি বছরের ১৯শে অক্টোবর ওই বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। দু'বার বিজ্ঞপ্তিতে তার পেছনে থাকা প্রার্থীদের নিয়োগ হলেও তাকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। তিনি বর্তমানে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রভাষক। ওই ছাত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উপসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) হোসনে আরা বেগম স্বাক্ষরিত পত্রে ২৭শে অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে বলা হয়, উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র বেগম ইশতার মহলের আবেদনটি পাঠানো হলো। এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে মতামত প্রদানে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। এর অনুলিপি প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের উপসচিব ড. কাজী লিয়াকত আলীকে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিভাগের চেয়ারম্যান এক পত্রে বলেছেন, উপরিউক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তটি নিয়োগ কমিটিতে গৃহীত হয়েছে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান হিসেবে আমার কিছুই করার নেই। প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে ব্যবস্থা নিতে বলা হলেও সম্প্রতি প্রশাসনিক ভবনের একটি অফিসে গিয়ে দেখা যায় প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে পাঠানো চিঠিটি টেবিলে কেবল ফাইল হয়ে আছে। কোন প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। একই ধরনের অভিযোগ করেছেন চারুকলার অনেক বঞ্চিত প্রার্থী

দলীয়করণের চিত্র: আরবি বিভাগে শিক্ষক চারজন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে। ২০শে সেপ্টেম্বর ভাইভার জন্য ডাকা হয় ৪০ জনকে। তাদের মধ্যে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয় জহিরুল ইসলাম, নাছির উদ্দিন, বেলাল হোসাইন, আশরাদুল হাসান ও আহমেদ হাসানকে। অথচ বেলাল হোসাইন ও নাছির উদ্দিনের দ্বৈত সার্টিফিকেট রয়েছে– যা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। অভিযোগ রয়েছে, দলীয় বিবেচনায় আরবি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার জন্যই কোন নিয়মনীতি মানা হয়নি। ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে চারজন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিলেও পাঁচজনকে নেয়া হয়েছে। দলীয় বিবেচনায় নেয়া হয় এম এল পলাশ নামের এক প্রার্থীকে। অনার্সে তার প্রথম শ্রেণীতে ১৮তম ও মাস্টার্সে ১৯তম অবস্থান। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এবং ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড থাকলেও তাদের নেয়া হয়নি। এছাড়া গত সপ্তাহে কম্পিউটার সায়েন্সেস বিভাগে তিনজন, হিসাববিজ্ঞানে দু'জন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে চারজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে দলীয় বিবেচনায়। শিক্ষক নিয়োগে এসব অনিয়মের প্রতিবাদ জানিয়েছেন ডিন, সিন্ডিকেট সদস্য ও সাদা দলের শিক্ষক।

ফলিত রসায়ন: ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দলীয়করণের অভিযোগ করা হয়েছে। ২৯শে আগস্ট ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৬টি শিক্ষক পদে নিয়োগের সুপারিশ করে সিলেকশন বোর্ড। মোট প্রার্থী ছিলেন ১৫ জন। ৬টি পদের মধ্যে তিন জন ছিলেন ইন্টারন্যাল প্রার্থী। তাদের চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে। বাকি তিনজনকে নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় পছন্দকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। নিয়োগকৃত তিনজনের মধ্যে মিঠুন সরকার অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় (মোট নম্বর ২০৬৪), মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় (মোট নম্বর ৪১৯)। অতিরিক্ত যোগ্যতা তিনি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক এবং প্রবন্ধ রয়েছে ৩টি। সুমাইয়াই ফারহানা অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে সপ্তম (মোট নম্বর ২০৮৭), মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম (মোট নম্বর ৪৪৮)। ১টি প্রবন্ধ ও ৪টি প্রকাশনা রয়েছে। তাসলিমা ফেরদৌস অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ (মোট নম্বর ২০৮৮), মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে ষষ্ঠ (মোট নম্বর ৪২৩)। অতিরিক্ত যোগ্যতা তিনি বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজির প্রভাষক এবং ৫টি প্রবন্ধ ও প্রকাশনা রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে এ তিনজন প্রার্থী নিয়োগ পেয়েছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দল করতে হবে এবং চলতি বছরে ডীন নির্বাচনে নীল প্যানেলে ভোট দেবেন এমন শর্তে মুচলেকা দিয়ে। এদের চেয়ে বেশি একাডেমিক রেজাল্ট ও যোগ্যতা সম্পন্ন তিন প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হয়নি।

কলা অনুষদ: ২৯শে জুলাই সিন্ডিকেট বাংলা বিভাগে চারজন এবং পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগে ২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে বাংলা বিভাগে একজন যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে কম যোগ্য প্রার্থীকে নেয়া হয়েছে। পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগে এক যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে ওই বিভাগের শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার স্ত্রীকে নেয়া হয়েছে। অনার্সে তার মাত্র ৪৬ শতাংশ নম্বর রয়েছে বলে সিন্ডিকেট সদস্য ও শিক্ষকদের অভিযোগ। ২০০৯ সালের শেষ দিকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে এ টি এম শামসুজ্জোহা, ইফতেখারুল ইসলাম, মাহমুদুর রহমান, মো. আবদুর রহিমসহ ৫ প্রভাষক নিয়োগ দেয়া হয়। এদের মধ্যে সম্মান শ্রেণীতে ৩২তম স্থান অর্জনকারী মো. আবদুর রহিমও নিয়োগ পেয়েছেন। মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী এবং অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণী আছে এমন প্রার্থীদের বাদ দেয়া হয়েছে। ওই নিয়োগের প্রতিবাদে সিলেকশন বোর্ডে কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন বাছাই বোর্ডে নোট অব ডিসেন্ট দেন। সিন্ডিকেটে অনুমোদনের সময়ও বিরোধিতা করেন তিনি।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ: লোক প্রশাসন বিভাগে অধিকতর যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে দলীয়ভাবে সহকারী অধ্যাপক পদে একজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম থাকলেও তাকে বাদ দিয়ে নেয়া হয়েছে অনার্সে তৃতীয় ও মাস্টার্সে দ্বিতীয় স্থান পাওয়া প্রার্থীকে। সিলেকশন বোর্ডে বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আ কা ফিরোজ আহমেদ এবং এক বিশেষজ্ঞ সদস্য এই নিয়োগের বিরোধিতা করে সিলেকশন কমিটির উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর না করে সভা ত্যাগ করেন। ২৯শে জুলাই সিন্ডিকেটে ওই নিয়োগের বিরোধিতা করে চারজন সিন্ডিকেট সদস্য নোট অব ডিসেন্ট দেয়ার পর তাদের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়। ২০০৯ সালের ২৫শে অক্টোবর সিন্ডিকেটে উন্নয়ন ও অধ্যয়ন বিভাগে প্রভাষক পদে শুভাশিস্ বাড়ৈ ও শেখ জাফর ইমরানের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়। আবেদনকারীদের মধ্যে তিনজন যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ৬ই সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেট নৃবিজ্ঞান বিভাগে পাঁচজনের নিয়োগ চূড়ান্ত করে। এরা হলেন সৈয়দ আরমান হোসেন, ইসরাত জাহান, সুরাইয়া হাবিব, ফারিবা আলমগীর, জোবাইদা নাসরীন। সিলেকশন কমিটির সদস্যদের অভিযোগ, নিয়োগপ্রাপ্ত সৈয়দ আরমান হোসেন, ফারিবা আলমগীর ও জোবাইদা নাসরীনের চেয়ে বেশি যোগ্য প্রার্থী ছিলেন ৩-৪ জন। ওই নিয়োগের বিরোধিতা করেছেন সিলেকশন কমিটির বিশেষজ্ঞ সদস্য ও শিক্ষকরা। নিয়োগকৃতদের মধ্যে জোবাইদা নাসরীন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং তিনি এনজিও কর্মী ছিলেন। তার চেয়ে

অভিযোগ ...

সম্বোধন দেখিয়ে এবং স্ত্রী হিসেবে সামাজিকভাবে উপযুক্ত মর্যাদা দেয়ার শর্তে অন্যায়ভাবে সিলেকশন বোর্ড বরাবর ভুয়া বিবাহের তারিখ উল্লেখ করে একখানা পত্র দিতে প্ররোচিত এবং বাধ্য করে। অতঃপর মো. মুমিত আল রশিদ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পর পরই আমার সঙ্গে বিভিন্ন রকম টালবাহানা শুরু করে। তার বিভিন্ন রকম কথাবার্তা, চালচলন ও আচরণে আমি ভীষণরকম মানসিক যন্ত্রণার শিকার হই এবং এক পর্যায়ে তাদের বাসায় যেতে আমি বাধ্য হই। তার পরিবার আমাদের বিবাহের ব্যাপার জানার পর সবাই আমাকে বোঝায় যে, যেহেতু মুমিত সবেমাত্র উপার্জন করতে শুরু করেছে ও আর্থিকভাবে যথেষ্ট সচ্ছল নয়, তাছাড়া এখনও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেনি এবং আমিও মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করিনি তাই সামাজিক দিক থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের পরিবারে আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে আরও সময়ের প্রয়োজন। সময়-সুযোগমতো মুমিতই বিবাহ-উত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ জানাবে। ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে মুমিতকে বিবাহ-উত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ নির্ধারণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে আমাকে জানায়, অনুষ্ঠান করতে এবং গবেষণা কার্যক্রম শেষ করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য কমপক্ষে ১৫ লাখ টাকা প্রয়োজন। তুমি আপাতত ২ লাখ টাকার ব্যবস্থা করো। ডিসেম্বরের শেষ অথবা জানুয়ারি ২০০৯-এর প্রথম সপ্তাহে তোমাকে নিয়ে সংসার শুরু করবো। এরপর আমি তাকে আমাদের বিভাগীয় [illegible] কলা ভবনস্থ রুম নং৪০২৮/ক অফিস কক্ষে যোগাযোগ করে বোঝানোর চেষ্টা করি। সে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং দিনের পর দিন আমি মানসিক ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হই। অবলা নারী হিসেবে সামাজিক মান মর্যাদার বিষয়টি চিন্তা করে কোন রকম আইনি পদক্ষেপ না নিয়ে নীরবে তার এহেন মানসিক ও শারীরিক লাঞ্ছনার কথা কাউকে না বলে সহ্য করি এই ভেবে যে, যদি সে সামাজিকভাবে আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা না দেয়। পরে মান-মর্যাদার ভয়ে ও তাকে বোঝাতে অপারগ হয়ে ২০০৮ সালের ১২ই অক্টোবর কলা ভবনস্থ অফিস কক্ষে আমার পরিবারের কাছ থেকে এক লাখ টাকা নিয়ে মুমিতকে দেই এবং বাকি টাকা অনুষ্ঠানের পর ব্যবস্থার কথা বলেছি। এর কয়েকদিন পর মুমিত আমাকে জানায়, এক মাসের মধ্যে বাকি টাকা পেলে তোমার পিতামাতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ নির্ধারণ করবো। নতুবা তোমার সঙ্গে ঘরসংসার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কথা শোনার পর আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি এবং রাগ-দুঃখ থেকে ময়মনসিংহে আমার বাবার বাসায় চলে আসি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি এবং সেখান থেকে মোবাইল ফোনে টাকা দেয়ার অপারগতার কথা জানালে সে আমাকে তার সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ না করার জন্য বলে। তারপর থেকে তার সঙ্গে বারবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ২০০৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুমিতের পরিবারের সঙ্গে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তার পরিবার জানায়, মো. মুমিত আল রশিদের সঙ্গে মির্জা সিফাত-ই-খোদার কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া মুমিত এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্য। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করুন। পরবর্তী সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারি যে, মো. মুমিত আল রশিদ আমাকে তালাকের নোটিশ পাঠিয়েছেন। পরে আমার বিভাগীয় শিক্ষকদের সহযোগিতার এবং পারিবারিকভাবে বিষয়টির সুরাহা করতে ব্যর্থ হই। এ অবস্থায় মো. মুমিত আল রশিদ কর্তৃক বেআইনি, অন্যায় ও নীতি বিবর্জিতভাবে এইরূপ ঘৃণিত কার্যকলাপ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বরাবর মিথ্যা তথ্য দিয়ে একই বিভাগে অধ্যয়নরত একজন কৃতী ছাত্রীর সঙ্গে বিবাহের নামে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে যৌতুক আদায়ের জন্য মানসিক, শারীরিক নির্যাতন ও হয়রানির মাধ্যমে সামাজিকভাবে মান-মর্যাদা, ভাবমূর্তির এহেন ঘৃণিত, নিকৃষ্ট, অনৈতিক ও প্রতারণামূলক কাজের ঘটনা সংঘটনের মাধ্যমে সর্বোপরি আমি ও আমার পরিবারের মানহানি এ সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করে আমার সুন্দর ভবিষ্যতকে ভূলুণ্ঠিত এবং অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী হিসেবে বর্ণিত ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক নৈতিক স্খলন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে অনুপযুক্ততাজনিত কারণে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের বিনীত অনুরোধ করছি।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য: এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি ও তদন্ত কমিটির প্রধান অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ বলেন, আমরা অভিযোগটি পেয়েছি। একটি তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে। কমিটি সব বিষয় তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এ বিষয়ে মুমিত আল রশিদ বলেন, ২০০৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। বিষয়টি সমাধান হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে কেউ এ কাজ করাচ্ছে। তিনি বলেন, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি সংসার টিকিয়ে রাখতে। কিন্তু তাকে আমি বোঝাতে পারিনি। বাধ্য হয়ে তাকে তালাক দিয়েছি। তার কাছ থেকে টাকা নেয়া বা নির্যাতনের অভিযোগ সত্য [illegible]

১২ই ডিসেম্বর ২০১১ কালের কণ্ঠ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বই পড়তে বাধ্য করছেন শিক্ষক

জাবি প্রতিনিধি ▸

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ইতিহাস বিভাগের এক শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী বই পড়তে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের নাম অধ্যাপক ড. মনজুর আহসান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান। অনেক শিক্ষার্থী জানান, বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ থাকলেও ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পান না।

এ বিষয়ে অধ্যাপক মনজুর বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত চেতনার জায়গা। এখানে যেকোনো বই পড়ানো যায়।' তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী বিষয়ের ওপর টিউটোরিয়াল ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়ারও অভিযোগ আছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ও বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মনজুর আহসান গত কয়েক বছর ধরে চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ৪০১ নম্বর কোর্স (বাংলার ইতিহাস ১৭৬৫-১৯৭১) পড়িয়ে আসছেন। ওই কোর্সের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে তিনি প্রতিবছরই শিক্ষার্থীদের দুটি বই পড়তে বাধ্য করেন। এগুলো হলো সাজ্জাদ হোসেনের 'একাত্তরের স্মৃতি' এবং শর্মিলা বোসের 'ডেড রিকনিং : মেমরিস অব দ্য নাইনটিন সেভেনটি ওয়ান বাংলাদেশ ওয়ার'। এই দুজন মুক্তিযুদ্ধের ঘোর বিরোধী লেখক হিসেবে খ্যাত। বই দুটি পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী চেতনায় লিখিত।

প্রতিবছরের মতো এবারও অধ্যাপক মনজুর চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী লেখকদের বই পড়তে বাধ্য করেছেন। ওই বইয়ের ওপর গত ৫ ডিসেম্বর একটি ক্লাস পরীক্ষা নেন। এ পরীক্ষার প্রশ্ন ছিল–'১৯৭১ সালের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও তাদের বিরোধী এ দেশীয় পাকিস্তানি সমর্থকদের মতাদর্শ আলোচনা করো'। স্বাধীনতাযুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানিদের মতাদর্শ পড়ানোর বিষয়টি ব্যাপকভাবে সমালোচনা করেছেন শিক্ষার্থীরা।

ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ড. লুৎফুল এলাহী বলেন, 'এমন ঘটনা সত্যি দুঃখজনক। বিষয়টি আগামী বিভাগীয় সভায় উপস্থাপন করা হবে।'

সমকাল
শুক্রবার
২৪ ডিসেম্বর ২০১০ ১০ পৌষ ১৪১৭
রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪

মাহবুবুর রহমান অনিন্দ্য (বাঁয়ে), জুবেরি ভবনের বারান্দায় সালমা — সমকাল

স্ত্রীকে বের করে দিয়ে রাবি শিক্ষক বললেন 'তালাক'

■ রাজশাহী ব্যুরো

নিজে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক। গত জুনে গোপনে বিয়ে করে ক্যাম্পাসে ফেরেন। গত বুধবার রাতে স্ত্রী হাজির হন শিক্ষকের আবাসস্থল জুবেরি ভবনে। শিক্ষক তাকে বাইরে বের করে দিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে চলে যান। রাতভর স্ত্রী বাইরে বারান্দায় বসে রাত কাটান। পরদিন বৃহস্পতিবার সারাদিনও থাকেন সেখানেই। রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। প্রশাসন, পুলিশ কেউই সুরাহা করতে >> পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৩

পারেনি স্ত্রীকে উপেক্ষার ঘটনার। এ ঘটনায় ওই শিক্ষকের স্ত্রী মতিহার থানায় মামলা দায়ের করেছেন। ক্যাম্পাসজুড়ে এ নিয়েই এখন আলোচনার ঝড়।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অভিযুক্ত প্রভাষক মাহবুবুর রহমান অনিন্দ্য গতকাল জুবেরি ভবনে এলেও সালমাকে ঘরে তোলেননি। টেলিফোনে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'তাকে (স্ত্রী) ১২ ডিসেম্বর আমি তালাক দিয়েছি। তাই আইনত সে আমার স্ত্রী নয়।' এ সময় তিনি অবশ্য তালাকের কাগজ দেখাতে পারেননি। এমনকি কী কারণে তালাক দিয়েছেন সে ব্যাপারেও কোনো কথা বলেননি।

প্রভাষক অনিন্দ্যর স্ত্রী সালমা জানান, তাকে তালাক দেওয়া হয়নি। পুরো ঘটনার বিবরণে তিনি জানান, তার বয়স ১৯ বছর। গত ৫ জুন কুড়িগ্রামে পারিবারিকভাবে তাদের বিয়ে হয়। কিন্তু ক্যাম্পাসে ফেরার পর থেকে অনিন্দ্য তার সঙ্গে যোগাযোগ ছেড়ে দেন। সালমার পরিবার মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীর কাছে পাঠাতে চাইলেও তিনি তাতে সম্মতি দেননি। একপর্যায়ে টেলিফোনে যোগাযোগ করেও তার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে সালমা গত বুধবার রাতে তার চাচাত ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এমএ [illegible] নয়নের সহযোগিতায় ক্যাম্পাসে আসেন। জুবেরি ভবনে অনিন্দ্য যেখানে থাকেন, সেই রুমে যাওয়ার পর প্রথমে সালমাকে ভেতরে ঢুকতে দিলেও একটু পরই অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে তাকে বাইরে বের করে দেন। নিজেও রুমে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যান। এরপর থেকেই সালমা বারান্দায় অবস্থান শুরু করেন। দাবি করতে থাকেন, অনিন্দ্য তাকে স্বীকৃতি দিয়ে ঘরে না তোলা পর্যন্ত তিনি নড়বেন না। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৮টা পর্যন্ত তীব্র শীতেও বাইরেই ছিলেন তিনি। রাতে খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চাচাত ভাই নয়ন তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হাসপাতালে সালমাকে নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাম্বুলেন্সই ব্যবহার করা হয়েছে। রাত ১১টায় সালমা মতিহার থানায় মাহবুবুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

এদিকে জুবেরি ভবনে এমন ধরনের ঘটনায় বিব্রত হয়েছেন শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে গতকাল পরিস্থিতি সবিস্তারে জানানো হয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগকে। রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ঘটনাস্থলে যান। তিনিও এর সুরাহা করতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মতিহার থানা থেকে পুলিশ নিয়ে গেলেও পারিবারিক বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে তাদের ফেরত পাঠানো হয়। রাবি প্রক্টর অধ্যাপক চৌধুরী মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, 'আমরা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানিয়েছি। তারাই তাদের শিক্ষককে নিয়ে সমস্যার সমাধান করবেন বলে আশা করছি।'

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মশিউর রহমানের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলার চেষ্টা করা হলে তার মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। তার বাসায় টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, তিনি বাসায় নেই। ওই বিভাগের দু'জন শিক্ষক সমকালকে জানান, বিষয়টি নিয়ে একাডেমিক কমিটির কোনো বৈঠক হয়নি। তবে দুপুরের দিকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান কয়েকজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষককে ডেকে জানিয়েছেন, রাবি শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে অনিন্দ্যর বিষয়টি অবগত করা হয়েছে। ওই দুই শিক্ষক সমকালকে জানান, বিভাগের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে অনিন্দ্যর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয় হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

সোমবার, ২৭শে ডিসেম্বর ২০১০

ঢাবি শিক্ষকের বউ তালাক তদন্ত কমিটি

সোলায়মান তুষার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন এক প্রভাষক। তার নাম মুমিত আল রশিদ। এই প্রভাষকের স্ত্রী এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ এই তদন্ত কমিটির প্রধান। অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ বলেছেন, আমরা অভিযোগটি পেয়েছি। তদন্ত হচ্ছে। বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মুমিত আল রশিদ ছাত্র থাকাকালে বিভাগেরই ছাত্রী সিফাত-ই-খোদা নামের ছাত্রীকে ২০০৫ সালের ২৫শে আগস্ট বিয়ে করেন। ২০০৬ সালের ২৮শে আগস্ট মুমিত আল রশিদ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি বিবাহিত হলেও নিয়োগপত্রে অবিবাহিত উল্লেখ করেন। শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়ার পর থেকেই তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ কমিয়ে দেন। বিষয়টি জানিয়ে সিফাত-ই-খোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। মুমিত আল রশিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, সিন্ডিকেট সদস্য, প্রোভিসি, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার, সব অনুষদের ডিন ও বিভাগের সব শিক্ষকের কাছেই অভিযোগ করেছেন। এই ছাত্রী তার ওপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন। এ ছাড়া তার কাছ থেকে এক লাখ টাকা নিয়ে দেননি বলেও অভিযোগ করেছেন। তবে শিক্ষক বলেছেন, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার। তার ক্ষতি করার জন্যই বিভাগের কেউ তার স্ত্রীকে দিয়ে এসব করিয়েছেন। তিনি সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক চেষ্টার পরও কোন কাজ হয়নি।

ছাত্রীর অভিযোগ: সিফাত-ই-খোদা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির কাছে অভিযোগে বলেছেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে বিএ অনার্স পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে মাস্টার্স শেষ বর্ষে একজন ছাত্রী হিসেবে অধ্যয়নরত আছি। এ বিভাগের মো. মুমিত আল রশিদ, পিতা মৃত এমএম আবুল কাসেম, গ্রাম ও পোস্ট নশাসন, থানা নড়িয়া, জেলা শরীয়তপুর, বর্তমানে রুম নং ৪০২৮/ক কলা ভবন ঢা.বি. ও ৫০৬/৩, পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকার সঙ্গে এই বিভাগে আমার পরিচয় হয়। তারপর থেকে সে আমাকে আমার বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে প্রেমের প্রস্তাব পাঠায়। বিভিন্ন কার্যকলাপে আমাকে প্রভাবিত করতে থাকে। এক পর্যায়ে তার সঙ্গে আমি ভালবাসায় জড়িয়ে পড়ি এবং পরে নিজের বৈধ স্ত্রী নয় জেনেও সে আমাকে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের কুপ্রস্তাব দেয়। আমি তাতে সাড়া না দিলে বিগত ২০০৫ সালের ২৫শে আগস্ট মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার ও কাজী ৫৭নং ওয়ার্ড রমনা ঢাকা অফিসে রেজিস্ট্রি নিকাহনামা মূলে আমাকে বিবাহ করে। ফলে স্বামী হিসেবে তার প্রতি আমার অগাধ আস্থা ও সরল বিশ্বাসের জন্ম নেয় এবং এই সুযোগে সুকৌশলে বেকার স্বামী হিসেবে আমার ভরণপোষণ বহন করতে পারবে না বিধায় সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে চাকরি পেলেই পারিবারিকভাবে সবাইকে জানিয়ে আমাকে নিয়ে ঘরসংসার শুরু করবে। ফলে আমি বাধ্য হয়ে বিবাহের বিষয়টি গোপন করে নিজ পরিবারে আলাদাভাবে বসবাস করতে থাকি। পরে আমার সঙ্গে প্রতারণা করে মো. মুমিত আল রশিদ ২০০৬ সালের ২৮শে আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ লাভের আবেদনপত্রে নিজেকে একজন অবিবাহিত ব্যক্তি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বরাবরে মিথ্যা ও অসত্য তথ্য প্রদান করে। বিষয়টি সম্পর্কে প্রোভিসি ও সভাপতি সিলেকশন বোর্ড, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর সে একই বছর ২৫শে আগস্ট নিজের অবস্থান ব্যাখ্যাপূর্বক উল্লেখ করে, 'যেহেতু আমরা দু'জনেই এখনও প্রতিষ্ঠিত হইনি সে কারণে আমাদের পারস্পরিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিষয়টি সামাজিকভাবে প্রকাশ না করার ব্যাপারে একমত হই। আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া অত্যন্ত চমৎকার এবং আমরা একে অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল'। তার এরূপ বক্তব্যের পক্ষে আমাকে বিভিন্ন অজুহাতে ভুল বুঝিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি-

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভা

শিক্ষককে অপসারণ, গবেষণা না করলে টাকা ফেরত দিতে ১৩ জনকে সতর্ক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ছুটি শেষে [illegible] যোগদান না করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক হাজেরা বেগমকে সহকারী অধ্যাপক থেকে অপসারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে অর্থ নিয়ে গবেষণা শেষ করতে না পারায় ১৩ জন শিক্ষককে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে গবেষণা শেষ করতে না পারলে নিয়মানুযায়ী এসব শিক্ষককে অর্থ ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন।

ছাত্রীকে অশ্লীল প্রস্তাব চবির এক শিক্ষককে বাধ্যতামূলক ছুটি

■ বিডিনিউজ

সমকাল
২২.০৪.২০০৭

পরীক্ষায় পাস করানোর প্রলোভন দেখিয়ে এক ছাত্রীকে অশ্লীল প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষক মোঃ শাহ আলমকে বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়েছে সিন্ডিকেট। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবু ইউসুফ গতকাল শুক্রবার বলেন, 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মাস্টার্সের এক ছাত্রীকে পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অশ্লীল প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে একই বিভাগের শিক্ষক মোঃ শাহ আলমকে বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক ছুটির শাস্তি দেওয়া হয়েছে।' তিনি জানান, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তে প্রাথমিকভাবে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং অভিযোগ তদন্তে একটি কমিটি করা হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে বরখাস্ত করা হতে পারে। অভিযোগ তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহফুজুল হক চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

www.kalerkantho.com

কালের কণ্ঠ ৩

৮ এপ্রিল ২০১০, বৃহস্পতিবার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

যৌন নিপীড়নের অভিযোগে শিক্ষককে বাধ্যতামূলক ছুটি

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ

বিভাগের এক ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মামুনকে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপউপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

উপউপাচার্য বলেন, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্রীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী আবদুল্লাহ আল মামুনকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট। তিনি জানান, এ ঘটনায় অধিকতর তদন্তের জন্য আরো একটি কমিটি গঠন করা হবে। ওই কমিটি প্রতিবেদন না দেওয়া পর্যন্ত আবদুল্লাহ আল মামুনকে বাধ্যতামূলক ছুটি ভোগ করতে হবে।

উল্লেখ্য, প্রায় চার মাস আগে বিভাগের এক ছাত্রী আবদুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের লিখিত অভিযোগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের কাছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির তদন্তে গতকাল আবদুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, 'পুরো ঘটনা সাজানো ও ষড়যন্ত্রমূলক। আমি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের প্রশ্নপত্র ফাঁস করার কথা প্রকাশ করার কারণেই আমার বিরুদ্ধে এসব অপবাদ দেওয়া হচ্ছে।' তিনি যৌন নিপীড়নের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

কালের কণ্ঠ

অভিযোগ কমিটি গঠন

সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, ব্যক্তি মালিকানাধীনসহ যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্ত ও অনুসন্ধানে অভিযোগ কমিটি গঠনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে খসড়া আইনে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মচারী এবং কর্মকর্তার মোট সংখ্যা ৫০ জনের ঊর্ধ্বে হলে অভিযোগ কমিটিতে পাঁচজন সদস্য রাখতে হবে। আর ৫০ জনের নিচে হলে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি থাকবে। সদস্যদের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান হবেন। কমিটির প্রধান ও বেশির ভাগ সদস্য নারী হবেন বলেও আইনের খসড়ায় সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটির কমপক্ষে একজন সদস্য থাকবেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে, যে প্রতিষ্ঠান নারী-পুরুষের সমতা (জেন্ডার) এবং মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করে।

অভিযোগ দায়ের

যৌন হয়রানির শিকার হলে কিভাবে কমিটির কাছে অভিযোগ করবে তাও খসড়া আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হয়রানির শিকার ব্যক্তি নিজে বা তাঁর প্রতিনিধি বা যাঁর সামনে ঘটনা ঘটেছে, তিনি চিঠি লিখে নির্দিষ্ট বাক্সে ফেলে অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। ঘটনার ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ করতে হবে। তবে এ সময়ের পরেও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে অভিযোগ করা যাবে। অভিযোগ কমিটির কাছে মৌখিকভাবেও অভিযোগ দায়ের করা যাবে। অভিযোগ কমিটির কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে কেউ এ ধরনের অভিযোগ করলে ওই সদস্যকে বাদ দিয়ে কমিটির অন্য সদস্যরা বিষয়টি তদন্ত করবেন।

প্রচলিত আইনের অপরাধ হলে

যৌন হয়রানির অভিযোগটি প্রচলিত আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হলে এ বিষয়ে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা থানায় মামলা দায়ের না হলে অভিযোগ কমিটির তাৎক্ষণিক দায়িত্ব হবে আইনানুযায়ী অভিযোগকারীর যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রয়েছে, সেসব বিষয়ে তাঁকে উপদেশ দেওয়া, পথপ্রদর্শন এবং তাঁকে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।

যৌন হয়রানির শাস্তি

কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কারো বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযোগ কমিটি লঘু ও গুরু—দুই প্রকারের দণ্ড দিতে পারবে বলে খসড়া আইনে বলা হয়েছে। লঘুদণ্ডগুলো হচ্ছে—তিরস্কার বা ভর্ৎসনা বা সতর্কীকরণ, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতি স্থগিতকরণ, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাইমস্কেল বন্ধ রাখা, অভিযুক্তের বেতন-ভাতাদি বা অন্য কোনো উৎস থেকে যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাত্রত্ব স্থগিতকরণ।

গুরুদণ্ড হচ্ছে—পদাবনতি বা টাইমস্কেলের নিম্নধাপে অবনমন, বাধ্যতামূলক অবসর, চাকরিচ্যুতি, অব্যাহতি, অভিযুক্তের বেতন-ভাতাদি বা অন্য কোনো উৎস থেকে যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় এবং ছাত্রত্বের অবসান। অভিযোগ কমিটির সিদ্ধান্ত না মানলে হয়রানির শিকার ব্যক্তি আদালতে যেতে পারবে বলে খসড়া আইনে বলা হয়েছে। এ ছাড়া সাক্ষ্য গ্রহণের সময়, আপস-মীমাংসার সুযোগ, মিথ্যা অভিযোগ দায়েরে দণ্ডের ব্যবস্থা, তদন্ত চলাকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত বা ছাত্র হলে তাঁকে ক্লাস করা থেকে বিরত রাখা এবং লঘু ও গুরুতর অপরাধেরও পার্থক্য রেখে আইনটি প্রণয়নে সুপারিশ করেছে আইন কমিশন। শাস্তির পর আপিলের সুযোগও রাখা হয়েছে।

ঢাকা, শনিবার
১০ মাঘ, ১৪১৬
২৩ জানুয়ারি, ২০১০
দৈনিক সংগ্রাম

আদালত অবমাননা করায় রাবি শিক্ষককে সিভিল জেলে আটকের নির্দেশ

রাজশাহী অফিস : আদালতের নির্দেশ অবজ্ঞা, অবমাননা ও অবহেলা করে দলীয় ক্ষমতা (ভিসির নির্দেশে) সভাপতির দায়িত্ব পালন করায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের অ্যাগ্রোনমি এন্ড এ্যাগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন বিভাগের সভাপতি ড. হাসান তারীককে সিভিল জেলে আটকের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।বিধি অনুযায়ী বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অধ্যাপক ড. আমিনুল হকের সভাপতি হওয়ার কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় ৭৩'র এ্যাক্ট লঙ্ঘন করে সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে ড. হাসান তারিককে নিয়োগ দেয়ায় নিয়োগ বঞ্চিত শিক্ষকের দায়ের করা মামলায় আদালত তাকে আটকের নির্দেশ দেয়। গত সোমবার আদালতের দেয়া এই নির্দেশের কপি গত বৃহস্পতিবার বিভাগে পৌঁছেছে বলে বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ড. মো: আমিনুল হক উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক থাকাকালীন সময়ে অ্যাগ্রোনমি বিভাগে সভাপতির দায়িত্ব পালন করার মত কোন সিনিয়র শিক্ষক না থাকায় ২০০৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২০০৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাকে ডেপুটেশনে (প্রেষণে) অ্যাগ্রোনমি বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। পরে তাকে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ওই বিভাগে প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ওই সময় বিভাগের সভাপতি ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক ড. মো: আরিফুল রহমান। গত ২২ সেপ্টেম্বর সভাপতির (আরিফুরের) মেয়াদ শেষ হলে বিভাগের সভাপতি হওয়ার একমাত্র যোগ্য ও সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে ড. আমিনুল হকের সভাপতি হওয়ার কথা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৩'র এ্যাক্ট ৩ (১) ধারা লঙ্ঘন করে তড়িঘড়ি করে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির ঠিক একদিন আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর বিএনপিপন্থী ওই শিক্ষককে বাদ দিয়ে রাবি রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনের (১১-এর পৃষ্ঠার ৭-এর কলাম)

জেলে আটকের নির্দেশ

(১২ পৃঃ ৬-এর কঃ পর)

মাধ্যমে সহযোগী অধ্যাপক ড. এম হাসান তারিককে সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এ ঘটনায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর নিয়োগ বঞ্চিত প্রার্থী ড. আমিনুল বাদী হয়ে রাজশাহী জজ কোর্টে রাবি ভিসি, রেজিস্ট্রার ও সভাপতিকে আসামী করে মামলা দায়ের করলে ২৩ সেপ্টেম্বর রাজশাহী সদর সিনিয়র সহকারী জজ মামলার শুনানি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতি স্থগিতাদেশ জারি করে। কিন্তু আদালতের ওই স্থগিতাদেশের কপি পাওয়ার পরেও রাবি প্রশাসন অবৈধভাবে নিয়োগ দলীয় ওই সভাপতিকেই কাজ চালানোর নির্দেশ দেয়। এরপর ড. আমিনুলের আইনজীবী ড. তারীকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেন। দীর্ঘ শুনানি শেষে গত সোমবার রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী জজ আদালত মামলাটির রায়ে ড. তারীককে সিভিল জেলে আটকের নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে ড. আমিনুল হক জানান, তাকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করার কারণে তিনি আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি লঙ্ঘনের পর ড. তারীক আদালতকেও অবমাননা করেছেন তাই বিধি অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হয়েছে। তবে ড. হাসান তারীক বিষয়টি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ঢাবির ফার্মেসি অনুষদ

মেধাবীদের বাদ দিয়ে দুই বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ!

● বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি এবং ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। দলীয়ভাবে গঠিত সিলেকশন কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশের ভিত্তিতে গত শনিবার রাতে সিন্ডিকেটের এক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে। চারজন সিন্ডিকেট সদস্য এ জাতীয় নিয়োগের বিরোধিতা করে সভায় 'নোট অব ডিসেন্ট' (আপত্তিপত্র) দিয়েছেন। ওই নিয়োগে দুই বিভাগের মোট চার মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থী বাদ পড়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগ : জানা যায়, ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগে দুইজন প্রভাষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এতে মোট আবেদন করেছিল সাতজন প্রার্থী। সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকদের অভিযোগ ১৯ অক্টোবর দলীয়ভাবে গঠন করা সিলেকশন বোর্ডে দুইজনকে নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে ■ ৫ম পৃ: ৭-এর কলামে

মেধাবীদের বাদ দিয়ে দুই বিভাগে

৩য় পৃষ্ঠার পর

ফলাফলে পিছিয়ে থাকলেও নিয়োগ পায় সুব্রত ভদ্র নামে এক প্রার্থী। তার ফলাফল অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে অষ্টম এবং মাস্টার্সে চতুর্থ। এ ছাড়া তার কোনো প্রকাশনা নেই।

নিয়োগ পাওয়া এই প্রার্থীর চেয়ে তুলনামূলক যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী ইশতিয়াক আহমেদকে বাদ দেয়া হয়েছে। ইশতিয়াক আহমেদ অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় ও মাস্টার্সে চতুর্থ। বিভিন্ন বিষয়ে তার ৯টি প্রকাশনা রয়েছে। ওদিকে তার এমবিএ চলমান।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল নিজ ডিসিপ্লিনের বাইরে এমবিএ থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ইশতিয়াক ফলাফলে এগিয়ে এবং এমবিএ কোর্স শেষ পর্যায়ে থাকলেও তাকে বাদ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি বিভাগ : ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি বিভাগে প্রথমবারে দুইজন প্রভাষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। কয়েক সপ্তাহ পর আবার আরো তিনজন প্রভাষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। পাঁচটি পদের বিপরীতে মোট ১৯ জন প্রার্থী আবেদন করে। গত ২০ অক্টোবর সিলেকশন কমিটির সভা হয়। ওই কমিটির সব সদস্যই দলীয় বিবেচনায় করা হয়েছে বলে শিক্ষকদের অভিযোগ। কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশে পাঁচজনের মধ্যে চারজনের ক্ষেত্রে অভিযোগ নেই। কিন্তু চার মেধাবীকে ডিঙিয়ে চতুর্থ পদে নিয়োগ দেয়া হয় শ্রেণীধার্ম চন্দ্র দাসকে। কাগজ যাচাইয়ে দেখা গেছে, শ্রেণীধার্ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে পঞ্চম, মাস্টার্সে দশম স্থানে। বাদ পড়েছেন– অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান প্রাপ্ত কে এম সামসুদ্দোহা। আরো বাদ পড়েছেন অনার্স ও মাস্টার্সে চতুর্থ স্থান প্রাপ্ত খন্দকার আয়শা আক্তার এবং অনার্সে সপ্তম ও মাস্টার্সে পঞ্চম স্থান অধিকারী নাজমা পারভীন।

পাঁচটি পদের মধ্যে শ্রেণীধার্মকে চতুর্থ নম্বর পজিশনে নেয়া হলেও তার চেয়ে ভালো ফলাফলধারী রুমানা মওলাকে নেয়া হয়েছে পঞ্চম পজিশনে। অথচ রুমানা মওলা অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান প্রাপ্ত।

সিন্ডিকেট সভা : ওই দুই বিভাগের নিয়োগের সুপারিশ গত ১০ ডিসেম্বর (শনিবার) রাতে সিন্ডিকেট সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে। মেধাবীদের বাদ দেয়ায় সভায় চার সিন্ডিকেট সদস্য দু'টি বিভাগের দুইজনের নিয়োগের বিরোধিতা করে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন। নোট অব ডিসেন্ট দেয়া সিন্ডিকেট সদস্য ড. মইনুল ইসলাম বলেন, সর্বোচ্চ মেধাবীরাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার যোগ্য। তাই ভালো ফলাফলধারী অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেধাবী প্রার্থী থাকতে কম মেধাবী নিয়োগ দেয়ায় আমরা দুইজনের ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়েছি। তিনি বলেন, যৌক্তিকভাবে বিরোধিতা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সিন্ডিকেটে সিলেকশন কমিটির সুপারিশকেই চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে সিন্ডিকেট।

ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের এক সিনিয়র অধ্যাপক বলেন, ফার্মেসি অনুষদের দু'টি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে চরম দলীয়করণ করা হয়েছে। যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের চেয়ে আরো চারজন যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থী ছিল। এ ধরনের নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করবে। দলীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগের তীব্র নিন্দা জানান তিনি।

কালের কণ্ঠ
৯ অক্টোবর ২০১০, শনিবার

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ —

▸▸ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাঠানো হয়েছে। খসড়াটি আইনে রূপান্তর করতে মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা হয়েছে। আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, বিচারপতি মো. আবদুর রশীদ কালের কণ্ঠকে বলেন, আইনটি প্রণীত হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির পরিমাণ কমবে বলে আশা করা যায়। তবে আইন হলেই অপরাধ কমে না। আইনের যথাযথ প্রয়োগই অপরাধ কমাতে সহায়তা করে।

আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন, আইন কমিশনের তৈরি খসড়া আইন ও সুপারিশ পর্যালোচনা করা হচ্ছে। পর্যালোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দেশে যৌন নির্যাতন ও যৌন হয়রানির জন্য আইন প্রচলিত আছে। দণ্ডবিধি এবং নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে এ অপরাধে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির জন্য পৃথক কোনো আইন এখনো প্রণয়ন করা হয়নি। এ দুটি ক্ষেত্রে যৌন হয়রানির বিষয়ে দণ্ডবিধি এবং নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে কোনো সংজ্ঞা দেওয়া নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে নারীরা নানা রকম যৌন নির্যাতন বা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে, যা নারীর শিক্ষা গ্রহণ ও স্বাভাবিক কাজ করায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক কর্তৃক একজন সহকর্মী শিক্ষিকাকে যৌন হয়রানির অভিযোগ সারা দেশে তোলপাড় সৃষ্টি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীর অভিযোগও সাম্প্রতিকালের আলোচিত ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, সরকারি-বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে অহরহ ঘটছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য পৃথক আইন প্রণয়নের আবশ্যকীয়তা দেখা দেয়।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষরকারী হিসেবে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধে অঙ্গীকারবদ্ধ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—সিডও, যা ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ অনুসমর্থন করে। এ কনভেনশনের ১১ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, রাষ্ট্র সমতার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করে কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এতে সব মানুষের সমান কর্মসংস্থানের অধিকার এবং নিরাপত্তার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। এ নীতির প্রথম অধ্যায়ে সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশের নারীদের অধিকার নিশ্চিত করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিমূলক ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধির ঘটনা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে নারীর সুরক্ষার জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি।

প্রচলিত আইনের অপ্রতুলতা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন যৌন হয়রানিমূলক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এক রায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কতগুলো নির্দেশনা দেন। যথাযথ আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত এ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ দেন আদালত। সর্বোচ্চ আদালত পৃথক আইন প্রণয়নের বিষয়েও তাগিদ দেন।

খসড়া আইনের উল্লেখযোগ্য দিক

প্রচলিত আইনে যৌন হয়রানিমূলক কিছু কর্মকাণ্ড ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে এ ধরনের অপরাধ দমনে কার্যকর ফল আসছে না। কেননা দণ্ডবিধির প্রচলিত শাস্তির চেয়ে কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত প্রশাসনিক শাস্তি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অধিক গ্রহণযোগ্য। এ কারণে স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে আইন কমিশন। আইনটির নাম দেওয়া হয়েছে 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন, ২০১০'।

খসড়া আইনে যৌন হয়রানির সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ আইনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা অনুসারে অভিযোগ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। খসড়া আইনে কারা কখন কিভাবে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ কমিটি কী কী পদক্ষেপ নেবে তা বলা হয়েছে। যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রচলিত আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হলে অভিযোগ কমিটির দায়িত্ব কী হবে তাও সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রদানের অব্যবহিত পরে আপস-মীমাংসার মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে। আপসে নিষ্পত্তি না হলে কমিটির পরবর্তী কার্যপদ্ধতি কী হবে তার বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিযোগের অনুসন্ধান চলাকালে ভিকটিম ও সাক্ষীদের জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা কী হবে তা খসড়া আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তের নিরাপত্তার বিষয়ে কী হবে তাও বলা হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযোগ কমিটি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কী কী করণীয়, খসড়া আইনে তার বিধানের কথা বলা হয়েছে। খসড়া আইনে মিথ্যা অভিযোগ দায়েরকারীর শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির সংজ্ঞা

আইন কমিশন উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী খসড়া আইনে যৌন হয়রানির সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে। ১৫টি আচরণকে যৌন হয়রানির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যৌন হয়রানি বলতে সরাসরি বা ইঙ্গিতে অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ, শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা; প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা; যৌন ইঙ্গিতবাহী কোনো কিছু উপস্থাপন বা উক্তি বা মন্তব্য বা প্রদর্শন করা, যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত বা গ্রহণযোগ্য নয় এমন আবেদন বা অনুরোধ করা, পর্নোগ্রাফি দেখানো, যৌন ইঙ্গিতমূলক মন্তব্য বা ইশারা করা; অশালীন অঙ্গভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের দ্বারা উত্ত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোনো ব্যক্তির অলক্ষ্যে নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ঠাট্টা বা উপহাস করা; চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ই-মেইল, নোটিশ, কার্টুনের মাধ্যমে বা বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, কারখানা, ক্লাসরুম, ওয়াশরুম, বাথরুম বা যেকোনো স্থানে বা দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক কোনো কিছু লেখা বা অঙ্কন করা বা চিহ্নিতকরণ বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো অশালীন বা যৌনতাসংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু রাখা বা দেখানো ইত্যাদি, যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণে কমনরুম, ওয়াশরুম, বাথরুম বা এ ধরনের কোনো স্থানে উঁকি দেওয়া, চরিত্রহননের উদ্দেশ্যে কারো ছির বা ভিডিওচিত্র ধারণ ও সংরক্ষণ, প্রদর্শন, বিতরণ, বিপণন ও প্রচার বা প্রকাশ করা, লিঙ্গগত কারণে বা যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা বিরত থাকতে বাধ্য করা, প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা; প্রতারণার মাধ্যমে, ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা; যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ-সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ করতে অস্বীকার করার কারণে কোনো ব্যক্তির পদোন্নতি বা পরীক্ষার যথাযথ ফলাফল বা অন্যান্য যেকোনো সুবিধাদি বাধাগ্রস্ত করা এবং যৌন প্রকৃতির যেকোনো প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক, বাচনিক বা ইঙ্গিতমূলক অভিব্যক্তিকে বোঝাবে।

আমিরুল মোমেনীন মানিক। বাংলায় বিএ অনার্স (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), এম.এ (এ.ইউ.বি)। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের 'সার্টিফিকেট কোর্স অন প্রিন্টিং এন্ড ব্রডকাস্ট জার্নালিজম' এর নিয়মিত অতিথি শিক্ষক। ফুল টাইম কাজ করেন দিগন্ত টেলিভিশনে। বিশেষ প্রতিনিধি ও সংবাদ উপস্থাপক। সাংবাদিকতার যাত্রা শুরু ১৯৯৮-এ। ওরা জাগতে চায়, মনমাঝি, তরুণকণ্ঠ পত্রিকা দিয়ে। প্রথম ইলেকট্রনিক মিডিয়া বৈশাখী টেলিভিশন। টিভি মিডিয়ার উপর প্রথম প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ভারতের এনডি টিভির অভিজাত দাশগুপ্তার কাছে। এরপর, সিএনএন এর একটি মেগা কোর্সও করেছেন।

গান লেখেন, সুর করেন এবং গাইবার প্রয়াস চালান।

সাড়া, সমর্পণ, কাদামাটি (লুৎফর হাসান সহযোগে), আপিল বিভাগ (নচিকেতা সহযোগে), আলোর পরশ তাঁর উল্লেখযোগ্য গানের অ্যালবাম। লেখালেখি করা তাঁর হৃদয়ের কাজ। সুর- সঞ্চারী (গানের ব্যাকরণ), ইবলিশ (নাটক), ব্লাডি জার্নালিস্ট (গদ্য), দশ তরুণের প্রেমের গল্প (যৌথ গল্পের বই) মানিকের লেখা বই। উদীচী ইতিহাস প্রতিযোগিতা পুরস্কার, ওয়ামি কালচারাল ফেস্টিভাল পুরস্কার এবং ইউনেস্কো ক্লাব পুরস্কার তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি। সময় পেলে ডকুমেন্টারি নির্মাণ করেন। চার দেয়ালের কাব্য, মধুর ক্যান্টিনের বাকির খাতা, অস্তিত্বে অনুভবে- মানিকের নির্মিত তথ্যচিত্র। গড়েছেন সেভেনটিওয়ান এবং বাফুন নামের দুটি মিডিয়া হাউজ। মুক্তচিন্তা ফোরামের মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন অন্যায়ের। উৎকর্ষ, পেশাদারিত্ব এবং উদারতা-এই তিনটি শব্দ ধারণ করে আমিরুল মোমেনীন মানিক পাড়ি দিতে চান দীর্ঘ পথ।